দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৭ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা।। ৮ ডিসেম্বর - ২০১৪।।
২১ অগ্রহায়ণ - ১৪২১।।
website : www.eswastika.com

কংগ্রেস নয়, কংগ্রেসী চিন্তন-মুক্ত দেশ গড়াই বড় চ্যালেঞ্জ

সাধন কুমার পাল.... পৃঃ ১৩

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত।।

৬৭ বর্ষ ১৫ সংখ্যা, ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

৮ ডিসেম্বর - ২০১৪, যুগাব্দ - ৫১১৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

খোলা চিঠি : বঙ্গে বহিরাগত বাড়ছে, মিছিলে হাঁটুন দিদিজনেরা □ সুন্দর মৌলিক □ ৯

জমিয়তের সভার বিপুল খরচের সূত্রটিকে টানলেই সন্ত্রাসবাদের সূত্রটি প্রকাশ্যে আসবে

□ গূঢ়পুরুষ □ ১০

পশ্চিম বাংলার ক্রান্তিকাল : সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের শ্মশানযাত্রা □ দেবব্রত ঘোষ □ ১১

কংগ্রেস নয়, কংগ্রেসী চিন্তনমুক্ত দেশ গড়াই এখন বড়ো চ্যালেঞ্জ □ সাধন কুমার পাল □ ১৩

ধ্বংসের মধ্য থেকে নির্মাণ □ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১৭

সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবনা □ মীরাদেবী বালা □ ২১

স্বাধীনতা সংগ্রামী ধর্মপ্রাণ বীর শহীদ জিতুবাবা

□ তরুণ কুমার পণ্ডিত □ ২৩

গীতার বিশ্বতত্ত্ব □ হেনরি কিসিংগার □ ২৭

পরিকাঠামোর অভাবে চকচকা শিল্পাঞ্চল এখন সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্য □ ২৯

আইনি সন্ত্রাস □ তারক সাহা □ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **অন্যরকম : ৩৩** □ **সুস্বাস্থ্য : ৩৫** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮** □ **খেলা : ৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৫ ডিসেম্বর
২০১৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
১৫ ডিসেম্বর
২০১৪

প্রধানমন্ত্রীর পূর্বদিকে যাত্রা

পূর্ব দিকে তাকাও— নীতি অনুসরণ করে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মায়ানমার, ফিজি ও অস্ট্রেলিয়া সফর করে এলেন। গিয়েছিলেন নেপাল সার্ক সম্মেলনে। এই সফরের ফলে আমরা কি পেলাম বা আরও কি পেতে পারতাম, তা নিয়েই আলোকপাত করেছেন **মে: জে: কে কে গঙ্গোপাধ্যায়**। সার্ক সম্মেলন নিয়ে আলোচনা করেছেন **অর্ণব নাগ**।

HB®

INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

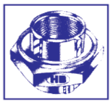

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিসর্জনের বাজনা

রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের বিসর্জনের বাজনা বাজাইবার আহ্বান জানাইয়াছেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। তৃণমূলকে সমূলে উৎখাতের ডাক দিয়াছেন তিনি। বস্তুত পুরভোট হইতেই পরিবর্তনের প্রত্যাশায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। যে আশা এবং স্বপ্ন লইয়া রাজ্যের মানুষ তৃণমূলকে সমর্থন করিয়াছিল, মাত্র তিন বছরেই সেই আশা এবং স্বপ্ন ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। রাজ্যের মানুষের কাছে এই সরকার এখন বোঝামাত্র। শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কোথাও উন্নয়ন নাই। দায় নাই, দায়িত্বও নাই। কেবল নিজের ঢাক নিজেই পিটাইতে ব্যস্ত এই সরকার। একেবারেই বিগত বামসরকারের হুবহু কার্বন কপি। দলতন্ত্রের যে সাধনা ইতিপূর্বে বামসরকার করিয়া গিয়াছে, তৃণমূল রাজত্বে তাহা আড়ে ও দৈর্ঘ্যে বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। তদুপরি তাহার প্রয়োগ নির্লজ্জতার সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছে দিন দিন। প্রশাসনিক ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে নিরপেক্ষতার দায়িত্ব অর্পিত হইয়া থাকে, সেই দায়িত্ব পালনই রাজধর্মের প্রধান কথা, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নিরপেক্ষতা নামক শব্দটি বামরাজত্ব হইতেই উধাও হইয়া গিয়াছে। সেই দিক দিয়া বাম সরকারের যথার্থ উত্তরাধিকারী এই সরকার। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যেখানে শেষ করিয়া গিয়াছেন, ঠিক সেই স্থান হইতেই শুরু করিয়াছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দাম্ভিকতা অহংসর্বস্ব ব্যক্তিত্বটিকেও হুবহু আয়ত্ত করিয়াছেন তিনি। 'আমরা-ওরা' শব্দটিকে আরও দৃঢ় ভাবেই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ আজ মহাপ্রস্থানের পথে। এই রাজ্যে আজ চোরেদের সমর্থনে মিছিল হইতেছে, দেশবিরোধী শক্তির সমর্থনে সভা হইতেছে আর পুলিশ লাঙ্গুল নাড়িয়া অপরাধীর পদতলে বন্দনারত। ইহার নাম পরিবর্তন? মানুষ এই পরিবর্তন চাহিয়াছিল? পরিবর্তনের নামে প্রতারণা হইয়াছে। মা-মাটি-মানুষের নাম করিয়া মা-মাটি-মানুষকে প্রতারণা করিতেছে এই সরকার। এই প্রতারকদের সমূলে উৎখাতের ডাক দিয়াছেন অমিত শাহ। তৃণমূল মুক্ত বাংলা গড়ার কথা বলিয়াছেন তিনি। কারণ সততার পূজারি এখন কালো মুখদের রক্ষা করিবার ব্রত লইয়াছেন। সংসদে কালো টাকা লইয়া নিত্য নাটক করিতেছেন অথচ সারদার কোটি কোটি টাকা লুঠ করিয়া সাধু সাজিতেছেন। তদুপরি জঙ্গিসংগঠন জামাত ইসলামিকে পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটিকেই বিক্রি করিবার মতলবে রহিয়াছেন। মানুষ এই প্রতারকদের কবল হইতে মুক্তির আশায় দিন গুনিতেছেন।

এই প্রতারক দেশোদ্রোহীদের অবিলম্বে সরকার হইতে বিদায় না করিলে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বই বিপন্ন হইবে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের জঙ্গিসংগঠন জামাতে ইসলামির কর্মী নেতারা দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইয়াছে। তাহাদের নিরাপদে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল দল। এই দলের এক সংসদ সদস্য বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় জামাতিদের ত্রাতা হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছেন। জামাতের সেইসব জেহাদি বাংলাদেশে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন, এই তৃণমূল সাংসদ গোপনে তাহাদের এপার বাংলায় আনিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের সাতক্ষীরার সাংসদ ওয়ার্কার্স পার্টির মুস্তাফা লুৎফুল্লা প্রকাশ্যে অভিযোগ করিয়াছেন, তৃণমূলের ওই সাংসদ সম্প্রতি বসিরহাট উপনির্বাচনে জামাতি ক্যাডারদের সাহায্যে তৃণমূলের নির্বাচনী প্রচার অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। সারদার লুঠ করা অর্থ তৃণমূলের সাহায্যে যে বাংলাদেশের জঙ্গিদের হাতে পৌঁছাইয়াছে তাহা আজ প্রমাণিত। বাংলাদেশের ফিউ-এর তৈরি তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সাড়ে ৬০০ কোটি টাকা গিয়াছে বাংলাদেশে। যাহার সিংহভাগই সারদার নানা পঞ্জি স্কিম হইতে সংগৃহীত অর্থ। আজও রাজ্যের সরকারি কোষাগার হইতে কোটি কোটি টাকা জঙ্গি তহবিলে দান করা হইতেছে, ইমাম ভাতা, মাদ্রাসা মসজিদের উন্নয়নের নামে। অথচ রাজ্যের ভাঁড়ার শূন্য।

ভিক্টোরিয়া হাউসের সম্মুখে বিজেপি-র সভার আতঙ্কে তৃণমূলের বিদায় ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর সেই আতঙ্কেই শুরু হইয়াছে উন্মাদের ন্যায় আচরণ। সংসদে নিত্য নতুন যাত্রাপালা এবং রাজ্যে উন্মাদের প্রলাপ শুনিতেছেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। ইতিমধ্যেই এই রাজ্যে বিজেপি-র পর্যবেক্ষক সিদ্ধার্থনাথ সিং আওয়াজ তুলিয়াছেন 'ভাগ, মমতা ভাগ'।

সুভাষিত

বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়
শক্তিঃ পরেষাং পরপীড়নায়।
খলস্য সাধোর্বিপরীতমেতৎ
জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়।।

অসৎ ব্যক্তির বিদ্যা বিতর্ক করার জন্য, ধন মদমত্ত হওয়ার জন্য এবং শক্তি অপরকে পীড়ন করার জন্য। কিন্তু এর বিপরীতে—সৎ ব্যক্তির বিদ্যা ও ধন দান করার জন্য এবং শক্তি দুর্বলকে রক্ষা করার জন্য।

উত্থান দিবসে রাজ্য-বিজেপির উত্থানের লগ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৩০ নভেম্বর ভারতীয় জনতা পার্টি বাপের ব্যাটার মতো লড়াই করে যখন ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর চিরকেলে ইজারা নেওয়া জায়গায় মিটিং বন্ধ রাখার সমস্ত রকমের ফন্দি-ফিকির চূর্ণ করে সভার অধিকার ছিনিয়ে নিল, তখন এই অধিকার অর্জন নিছক একটি জনসভার পরিধি ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশ গেড়ে বসা দিদির একনায়কতান্ত্রিক শাসনের মৌরসীপাট্টার ভিতটাই নাড়িয়ে দিল। এই সভায় আসা মানুষের ঢলকে একটি রাজনৈতিক দলের চূড়ান্ত অপশাসনের বিরুদ্ধে বিজেপি-র প্রতি শুধু সমর্থনজ্ঞাপক নয়, এক গড্ডলিকাপ্রবাহের বিরুদ্ধে, রাজনীতির ক্রম-অধোগতির সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধী শুভ চেতনার মুহূর্ত।

লক্ষণীয়, বিজেপি-র অনুমতি অর্জনের পর থেকে তুমুল ক্রোধান্বিত আমাদের অসহিষ্ণু মুখ্যমন্ত্রী আর উচ্চবাচ্য করেননি। মুখ্যমন্ত্রীর চিরাচরিত ২৭০০ বর্গফুটের সভামঞ্চ থেকে তাঁর মঞ্চ মাত্র এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মাত্র ৯০০ বর্গফুট হওয়ার অনুমোদন পেয়েছে। অত্যন্ত কাব্যিক তুলনায় এই চরম বৈষম্যমূলক আচরণের ব্যাখ্যা দিয়ে শ্রী শাহ বলেন, ‘‘সভাকে লিয়ে জমিন আপ ছোটা কর সকতে হ্যায় লেকিন হাজারো বঙ্গালবাসীকে দিলমে ভাজপা কে লিয়ে জো স্থান মিলা উসকো আপ কভী ছোটা নেহী কর সকতে।’’

রবিবারের দুপুর যখন বিপুল জনতার উল্লাসে বিকেলের পথ ভুলতে বসেছে তখনই শোনা যায় দলীয় সভাপতির বজ্রনির্ঘোষ। ১২৫ কোটি দেশের শাসকদলের অত্যন্ত সফল এক সভাপতিকে কোনো রাজ্যের একটি আঞ্চলিক দলের মুখ্যমন্ত্রীর টুসকি মেরে ‘‘কে অমিত শাহ ওকে তো চিনি না’’ বলার আস্ফালন তিনি ভোলেননি। এই রাজনৈতিক শিষ্টাচারহীন দলনেত্রীর উদ্দেশে তিনি খুল্লাম খুল্লা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘‘অগর দেখ সক্‌তে তো দেখ লিজিয়ে, অউর শুন সক্‌তে তো শুন লিজিয়ে ম্যায় অমিত শাহ হুঁ। ম্যায় ভাজপা কা এক সাধারণ কার্যকর্তা। লেকিন ভাজপাকে সভাপতি হো কর ম্যায় বঙ্গাল মে আয়া হুঁ— তৃণমূল কংগ্রেস কো জড় সমেত বঙ্গালসে উখাড় ফেকনেকে লিয়ে’’। অনুমান করা যায়— শা-র বক্তব্য শুনে তাদের হৃৎস্পন্দনের গতি ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এর হাতে গরম প্রতিক্রিয়ায় সুব্রতবাবু বলেন, ‘বিজেপি সিবিআই এবং এন আই এ-কে নিজের স্বার্থে কাজ করিয়ে তৃণমূলকে নিশানা করছে।’ এই সুযোগসন্ধানী রাজনীতিক ইচ্ছে করেই ভুলে গেছেন যে সিবিআই কাজ করছে সুপ্রিম কোর্টের আদেশে আর বর্ধমান বিস্ফোরণ আন্তর্জাতিক আতঙ্কবাদের মাত্রা পাওয়ায় এন আই এ কর্তারা নবান্নের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে গেছেন। তখন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এই তদন্তকে স্বাগত জানিয়ে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

এদিনে সভায় বর্ধমানের খাগড়াগড় বিস্ফোরণে নিহত শাকিল আহমেদের নাম উল্লেখ করে শাহ বলেন, এই ব্যক্তি আগে কলকাতার বুকের ওপর মেটিয়াবুরুজের বিস্ফোরণেরও পাণ্ডা ছিল। কেন তাকে দিদির পুলিশ ধরেনি? পড়াশোনা করে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর নিয়ে এসেছিলেন শাহ। খাগড়াগড়ের যে হান্নান চৌধুরীর বাড়িতে বোমার কারখানা খোলা হয়েছিল তিনি কোন্ রাজনৈতিক দলের লোক তাও জানতে চান। জানতে চান সারদাকাণ্ডে যে সাংসদরা জেলে দিদি তাদের নির্দোষ বলছেন কিনা। শুধু তাই নয়, জঙ্গিকাণ্ডের অর্থ জোগান ও সারদা কেলেঙ্কারির যোগসূত্র বোঝাতে তিনি পুনর্বার দিদির ছবি ১.৮৬ কোটি টাকায় কেনা মহানুভবের নাম দাবি করেন। একই সঙ্গে এই প্রসঙ্গে তিনি তৃণমূলনেত্রীর মিথ্যে নাটক বন্ধ করার আর্জি জানান। ভিড়ে ঠাসা জনতার উদ্দেশে শাহ বলেন, ‘মোদীজী বাংলার উন্নয়ন চাইলেও কি মুখ্যমন্ত্রী তা করতে দেবেন?’ সমবেত জনতার নেতিবাচক সম্মতির খেই ধরে শাহ বাংলার কেন্দ্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য বিজেপি-র সরকার গঠনের আহ্বান জানান। ধুরন্ধর রাজনীতিক অমিত শাহ জানেন ২৩৫-এর পাশবিক সংখ্যাধিক্যের বামশাসনে ২০১০ সালে মমতা প্রথম কলকাতা করপোরেশন দখল করেছিলেন আর ২০১১-য় বিধানসভা। ১৪৪ সদস্যের কলকাতা পৌরসভা অঞ্চলে ২০১৪-এর লোকসভা ভোটের নিরিখে বিজেপি-র প্রাপ্ত ভোট ২৭ শতাংশ। এগিয়ে ২৬টি ওয়ার্ডে, খুব অল্প মার্জিনে দ্বিতীয় স্থানে ৫৬টিতে। অন্যদিকে তৃণমূল ১০০০-এর কম ভোটে এগিয়ে আছে ৩৪টি ওয়ার্ডে। ভোট শতাংশ ৩৫। এসবই তুল্যমূল্য হিসেব করছেন বিজেপি-র ইউ পি, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র জয় করা এই তুখোড় চাণক্য। আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে থেকে তিনি ঘোষণা করে গেলেন চলতি ঝাড়খণ্ড ও কাশ্মীরের নির্বাচনে জিতে দল ইতিহাস গড়বে। কিন্তু তাঁর ভিক্টোরিয়া হাউস-এর মিটিং-এ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা বঙ্গ বিজয়। কয়েক লক্ষ উদ্বেল সমর্থকদের লক্ষ্য করে তিনি বলে গেলেন এই বিজয়ের প্রথম ধাপ হিসেবে কলকাতা করপোরেশন দখল করার প্রতিজ্ঞার কথা। তখন ঘড়ির কাঁটা চারটে পার করেছে। এবার ঘরমুখী প্রত্যয়ী, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জনতা।

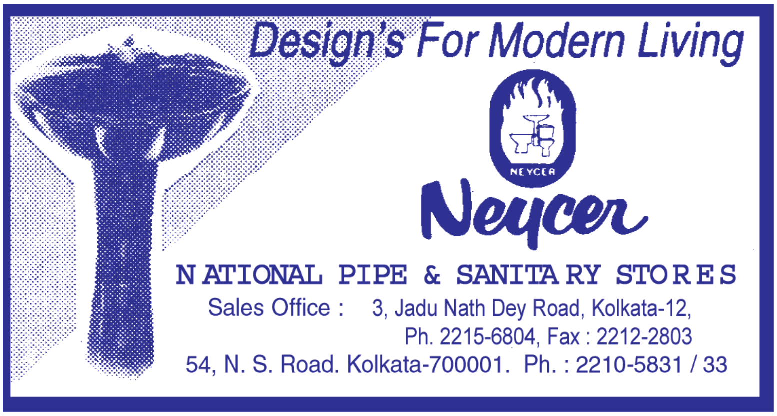

ছাতায় বাঁচবে মাথা ?

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সংসদে যখন কালো ছাতা মাথায় নিয়ে দেশে কালো টাকা ফেরানোর দাবিতে তৃণমূল সাংসদরা উত্তাল, তখন লোকসভার অধ্যক্ষা সুমিত্রা মহাজন একটি মোক্ষম কথা বলে ফেলেন— আপনারা (তৃণমূল সাংসদরা) আলোচনা চাইছেন, না হট্টগোল চাইছেন। বাস্তবিক এই গোলমাল করা ছাড়া তৃণমূলের আর কোনো গত্যন্তর নেই। কিন্তু খামোকা সিবিআই আর কেন্দ্র সরকারের বকলমে বিজেপি-কে গালাগাল না দিয়ে অবিলম্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচিত সুপ্রিম কোর্টকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো। তবে অবশ্যই শালীনতার মাত্রা বজায় রেখে। নয়তো আদালত অবমাননার দায়ে সারদাকাণ্ডে সাজা পাওয়ার আগেই তাঁকে জেলে ঢুকতে হতে পারে। যে জন্য মমতার এহেন সারদা-অস্বস্তি, তার পেছনে সিবিআই বা 'র' কেউ নেই, রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়। যাতে সিবিআই-কে সরাসরি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দেশের বৃহত্তম আর্থিক প্রতারণার পেছনে কোন কোন প্রভাবশালী জড়িত রয়েছে তা খুঁজে বের করতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বে একটি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। সারদা-দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসার পর এত অসহায়, দরিদ্র, নিরন্ন, বুভুক্ষু মানুষের বিরাগভাজন হতে হবে বুঝে সারদা মালিক সুদীপ্ত সেনকে জেলে পুরেছিলেন। কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ আদালত বুঝেছিল ক্ষমতাসীন আর প্রভাবশালীরা পেছনে না থাকলে এতবড় প্রতারণা করা সম্ভব নয়।

তখনও কুণাল চোর, টুম্পাই (সৃঞ্জয় বোস) চোর, মদন চোর, মুকুল চোর কিংবা নিজেকে চোর বলে ভাবার কোনো কারণ দেখেননি তিনি। কিন্তু সিবিআই সেটা ভাবতে পারে বুঝে তাদের আটকাতে খুব বেশি নয়, মাত্র এগারো কোটি টাকা খরচ করেছিলেন! কিন্তু শেষ রক্ষা হওয়া যে অসম্ভব এটা তাঁর বোঝা উচিত ছিল। কারণ চিটফান্ডের রমরমা বাড়াতে সুদীপ্ত সেন যেটাকে মূল অস্ত্র করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে মিডিয়া ব্যবসা। আর তাঁর এই ব্যবসা পরিচালনার দায়ভার ছিল কুণাল ঘোষের ওপর। যিনি ছিলেন মমতার প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর অন্যতম কাণ্ডারি এবং যার পুরস্কারস্বরূপ মমতা যাঁকে রাজ্যসভাতেও পাঠান। আর কুণালের বস ছিলেন মমতার টুম্পাই। তিনিও দলনেত্রীর কৃপায় রাজ্যসভার সাংসদ। সুতরাং এঁদের জেলযাত্রা কোনো সংশয়ের অবকাশ রাখে না, অবশ্য নেত্রীর বিরাগভাজন হয়ে কুণাল তার আগেই জেলে ঢুকেছিলেন। মমতা নিজেই কান টেনেছেন, এরপর মাথারা তো আসবেই।

এই মাথাদের মধ্যে শীর্ষস্তরে রয়েছেন মদন, বিষ্ণুপুরে সারদা-ব্যবসা বাড়াতে তাঁর উদ্যমী ভূমিকার ভিডিও ফুটেজ এখন প্রতিটি মিডিয়ার হাতে। মুকুল আর তাঁর পুত্র শুভ্রাংশু রায়ের সঙ্গে সারদা-চিটফান্ডের আরেকটি পত্রিকা কলমের কর্তাব্যক্তিদের ছবিও এখন প্রতিটি সংবাদপত্রের হাতে। এক্ষেত্রে মমতা স্বহস্তে দ্বিতীয় যে কর্ণটি টেনেছেন সেটি অবশ্যই আসিফ খান। যিনি এক সময়ের মুকুল ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা। এ ধরনের কান-টানায় বড়ো মাথাদের পাশাপাশি ছোটো মাথারাও এখন সিবিআইয়ের জালে যেমন শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়, শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, রজত মজুমদার এবং এখনও অবধি অপ্রকাশিত অনেক নাম। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক সিবিআই এখন যে পথে চলছে তাতে তাদের গন্তব্য মোটামুটি পরিষ্কার। কারণ ডেলো পাহাড়ে সারদা ও রোজভ্যালি চিটফান্ডের কর্ণধারদের সঙ্গে মমতার বৈঠকের কথা সকলেরই জানা। সুতরাং এই তদন্ত-পথ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তারির মধ্যে দিয়েই (যে দাবি তাঁর একদা সহচর কুণাল ঘোষ নিত্য-নৈমিত্তিক তুলছেন) শেষ হবে তা অনুমান করার জন্য জ্যোতিষী হবার প্রয়োজন পড়ে না।

গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণ কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল সাংসদ ইমরানের সঙ্গে বাংলাদেশে জামাত-জঙ্গি যোগ এবং সারদার টাকা তার পেছনে ঢালবার মতো প্রায় প্রমাণিত অভিযোগও উঠেছে। রাজনাথ, জেটলি কিংবা আদবানির মতো বিজেপি-র সর্বোচ্চ নেতাদের সঙ্গে দরবার করে আত্মরক্ষার কোনো আশ্বাস পাননি মমতা। নিরপেক্ষ কেন্দ্রীয় তদন্তের কাজে সরকার যে কোনো নাক গলাবে না তা বুঝে ফেলতে দেরি হয়নি তৃণমূল নেত্রীর। আর এর ফলেই কোনোদিন কালো ছাতা মাথায়, কোনোদিন কালো শাল জড়িয়ে, আবার কখনও বা হাঁড়ি নিয়ে নৃত্য করে সারা দেশের লোক হাসাচ্ছেন মমতার সাংসদেরা।

এই প্রতিবেদন লেখার সময় অবধি সংসদে তৃণমূলের নয়া নাট্যপালা লাল ডায়েরি হাতে বিক্ষোভ। এই লাল ডায়েরির আবির্ভাবক সুব্রত মুখোপাধ্যায়। সাহারা আর্থিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সুব্রত রায়ের ওই ডায়েরিতে নাকি মোদী, অমিত শাহের নাম আছে। এহেন অভিযোগের মূল সূত্র রাজ্য-মন্ত্রী সুব্রতবাবুর শোনা কথা। এই কথাটি তিনি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছেন কিনা জানালে দেশবাসীর হিসেব মেলাতে সুবিধে হোত। এস এফ আই ও'র রিপোর্ট কিংবা ইডি-র তদন্তে তৃণমূল আর সারদা মিলেমিশে গেছে। তাই সুব্রতবাবুদের উচিত সিবিআই কিংবা এন আই এ-কে বিজেপি-র শাখা না বলে, তৃণমূলের আর্থিক-শাখা হিসেবে সারদা-কে স্বীকার করে নেওয়া। ছাতায় ঢেকেও মাথা বাঁচার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু দেওয়ালে মাথা কুটে তা ফাটানোরও কোনো মানে হয় না। ■

বিজেপি-র কর্মী-সমর্থকদের উপর তৃণমূলের হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ লোকসভা ভোটের আগে ব্রিগেডে নরেন্দ্র মোদীর সভায় সামিল হওয়ায় বিজেপি সমর্থকদের তৃণমূলী সন্ত্রাসের মধ্যে যেমন পড়তে হয়েছিল, তেমনি গত ৩০ নভেম্বর ধর্মতলায় বিজেপি-র উত্থান দিবসে আসা এবং যাওয়ার সময়ও সেই একই চিত্র ফুটে উঠল। ঘটনার সূত্রপাত ২৯ তারিখ রাতে। ধর্মতলার সভায় যাওয়ার পথে রঘুরাম মাল নামে এক বিজেপি সমর্থককে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটে পাড়ুই থানার সেকমপুর বাসস্ট্যান্ডে। গদাধরপুর গ্রামের রঘুরাম মাল নামে ওই বিজেপি সমর্থক জানান, 'সিউড়ি থেকে ময়ূরাক্ষী ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার ধরে সাঁইথিয়া গিয়ে সেখান থেকে গৌড় এক্সপ্রেস ধরে ধর্মতলায় অমিত শাহর সভায় যোগ দিতে যাওয়ার কথা ছিল আমাদের। সেরকমই গদাধরপুর গ্রাম থেকে আমরা ২০-২৫ জন দলীয় কর্মী সেকমপুর বাসস্ট্যান্ডে হাজির হই। কিন্তু ঘটনাস্থলে প্রায় ৫০ জনের একটি তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীর দল আমাদের উপর অতর্কিতে হামলা চালায়। এরপর লাঠি ও রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় আমাদের ওপর। পরে আমাদের সমর্থকদের আসতে দেখে তারা চম্পট দেয়। রঘুরাম মাল বর্তমানে সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কিন্তু এই হামলার ঘটনার পুলিশকে অভিযোগ করা হলেও যথাযথ ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি।

আবার সভা শেষে বাড়ি ফেরার পথে হুগলীর তারকেশ্বর ও হরিপালের মধ্যবর্তী এলাকা পিয়াসারা এলাকাতেও হামলার ঘটনা ঘটে। জানা যায়, খানাকুল থেকে একদল বিজেপি সমর্থক ২৬নং রুটের বাস ভাড়া করে সভায় গিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় সভা শেষ করে ফেরার সময় তৃণমূল সমর্থকরা বাঁশ ও লাঠি দিয়ে তাদের বেধড়ক মারধর করে। জখম অবস্থায় ৯ জনকে আরামবাগ হাসপাতলে ভর্তি করা হয়।

বিজেপি নেতা সমর্থকদের অভিযোগ পিয়াসারার কাছে তাঁদের বাসের সামনে লরি দাঁড় করিয়ে দেয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা, এরপর ইট ছুঁড়ে বাসের জানালা ভেঙে দেয়। কেন তারা কলকাতার সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন তার শাস্তি হিসাবে এলোপাথাড়ি মারধর শুরু হয়। বিজেপি-সহ সভাপতি স্বপন পাল বলেন, তৃণমূল সমর্থকদের এহেন হামলায় অনেকের মাথা ফেটে গিয়েছে, চোট লেগেছে বুকেও। এছাড়াও পাড়ুই, হুগলী ছাড়াও হামলার ঘটনা থেকে বাদ যায়নি দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরও। সভায় যাওয়ার সময়ই তৃণমূল সমর্থকরা সোনারপুরের কালীবাজার এলাকায় বিজেপি কার্যকর্তাদের উপর হামলা চালায়। সক্রিয় বিজেপি কর্মী জীবন চক্রবর্তীর মাথা ফাটিয়ে দেয় তারা। সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন আহত অবস্থায় সুভাষগ্রাম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কিন্তু রাজ্যের একের পর এক জায়গায় চাঞ্চল্যকর এমন হামলার ঘটনা ঘটলেও কার্যত পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

স্বচ্ছতা অভিযানে দারুল উলুম

সংবাদদাতা॥ ভারত ইসলামিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র উত্তরপ্রদেশের দারুল উলুম দেওবন্দ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বচ্ছ ভারত অভিযানকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। সংস্থার রেক্টর মুফতি আবুল কাসিম নৌমানি বনারসি দেশের মুসলমান সমাজের কাছে এই অভিযানে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

সংস্থার জনসম্পর্ক আধিকারিক আশরফ উসমানি বলেন— কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়নমন্ত্রী বেঙ্কাইয়া নাইডু স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশগ্রহণ করার আশা প্রকাশ করে এক পত্র লেখেন। প্রতিষ্ঠানের ভিসি মুফতি আবুল কাসিম নৌমানি বনারসি জবাবি পত্রে জানান যে, নোংরা খুব বড় সামাজিক ব্যাধি। এর দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের খুব ক্ষতি হয়। স্বাধীনতার ৬৭ বছরে এবিষয়ে কেউ মনোযোগ দেয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এ বিষয়ে দেশবাসীকে সচেতন করাটা খুবই আনন্দের বিষয়। দারুল উলুম সর্বতোভাবে এই অভিযানে সামিল হবে।

প্রধানমন্ত্রীর এই পদক্ষেপকে নৌমানি খুব প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করেন। মুসলমান সমাজকে এই অভিযানে সামিল হওয়ার আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, ইসলামে পরিষ্কার ও পবিত্রতার বিষয়ে খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়। তিনি কোরানের একটা আয়াতের উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ্ পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতাকে খুব পছন্দ করেন। পয়গম্বর মহম্মদ সাহেবও পরিচ্ছন্নতাকে অগ্রাধিকার দিতেন। নৌমানি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মতো দারুল উলুমও চেষ্টা করছে যাতে স্বচ্ছ ভারত তৈরি হয়।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, দারুল

উলুমের এই আবেদন মুসলমান সমাজে ভালো সাড়া ফেলেছে। মুসলমানরা বিনা সঙ্কোচে এই অভিযানে সামিল হয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন--- এই অভিযান সর্বজনমান্যতা পেয়েছে এটা তারই প্রমাণ।

বঙ্গে বহিরাগত বাড়ছে, মিছিলে হাঁটুন দিদিজনেরা

মাননীয় বুদ্ধিজীবী সমীপেষু,

হাঁটুন, হাঁটুন আরও মিছিলে হাঁটুন। দিদির দুর্দিনে মিছিলে না হাঁটলে আপনাদেরও দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে। হুমকি ভাবলে হুমকি ভাবুন কিন্তু এই হুঁশিয়ারিকে অবজ্ঞা করবেন না।

দিদি কি চোর? অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন হঠাৎ। বুদ্ধি না থাকলেও বুদ্ধিজীবীরা কেন মিছিল করলেন? কী কারণে মিছিল সেটা না জেনেই কেন হাঁটলেন? তাঁদের জন্য বলে দিই, সব কিছু জেনে করতে হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? না জেনেও তো অনেক কিছু করতে হয়। যেমন সুদীপ্ত সেনকে ছবি বিক্রি করলে এত হ্যাপা হবে জানলে কি দিদি সেটা করতেন? কুণাল, সৃঞ্জয়দের সাংসদ বানালে এত কালি মাখতে হবে সেটা কি জানা ছিল? সারদার এজেন্ট মদনকে মন্ত্রী করলে এমন ল্যাজে গোবরে অবস্থা হবে সেটাও কি আগাম জানা ছিল? সব কিছু জানা থাকলেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারটাকে চাপে ফেলে কিনে নেওয়া যাবে না সেটা তো ভাবাই যায়নি। এখন দিদি পদে পদে বুঝতে পারছেন, মেরুদণ্ডহীন কংগ্রেস সরকার টিকিয়ে রাখলে কতই না ভালো হোত।

সুতরাং কারণ না জানতে চেয়ে হাঁটুন, হাঁটুন মিছিলে হাঁটুন। জানুন শুধু একটাই কথা দিদি চেয়েছেন তাই হাঁটতে হবে। না হলে বাংলার সাংস্কৃতিক বিপদ। আসলে আপনারা কোনো সাংস্কৃতিক কাজই করতে পারবেন না। নাটক, সিনেমা, সিরিয়াল সব শিল্প লাটে উঠে যাবে। জানেন না তো দিদির নেটওয়ার্ক কি স্ট্রং! দিদি বাংলা বাজারের সব থেকে বড় প্রোডাকশান হাউজ বেঙ্কটেশের টিকি ছুঁয়ে ফেলেছেন, দুর্নীতির দরজা খুলে দিয়ে, বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দিয়ে দাসানুদাস বানিয়ে দিয়েছেন। এখন তারাই বাজারটা দেখে। আর আপনারা শিল্পী, কলাকুশলীরা সেই বাজারের কাঁচামাল।

যাই হোক বাংলার সত্যিই খুব বিপদ। বহিরাগতে ভরে যাচ্ছে বাংলা। প্রথমে সারদার হাত ধরে এল বহিরাগত ইডি। একে তাকে ডেকে ডেকে ধমকে-ধামকে দিদি হয়ে উঠেছে ইডি। এরপর এল সিবিআই। বড় বহিরাগত। খাগড়াগড়কাণ্ড আবার আর এক বহিরাগত এন আই এ-কে নিয়ে এসেছে। সবাই মিলে দিদির শান্তির সংসার একেবারে ছারখার করে দিতে বসেছে। বেশ শুভার ছবি, ইন্দ্রনীলের গান, অর্পিতার নাটক, জেলায় জেলায় সাইকেল বিলি, মেলা মোচ্ছব, সারদা নিয়ে কমিশন কমিশন খেলা চলছিল। তার মধ্যে আর এক বহিরাগত সুপ্রিম কোর্ট ঠেলে দিল তদন্ত।

আর সব শেষে কিনা বহিরাগত বিজেপি এই বাংলায় ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে লেগেছে। বহিরাগত অমিত শাহর কত বড় সাহস দিদির মিটিং প্লেস ভরিয়ে দিল। আবার হুঙ্কার ছাড়ল, 'মমতাদিদি, আপনি জানতে চেয়েছিলেন, কে অমিত শাহ। দেখতে পেলে দেখে নিন। শুনতে পেলে শুনে নিন। ম্যায় হুঁ অমিত শাহ। তৃণমূলকে উৎখাত করতে আমি এখানে এসেছি।' আগেই বোঝা গিয়েছিল বিজেপি-র সভায় লোক হবে। দিদির রেকর্ড ভেঙে দেবে। তাই সেই দিদির এলাকা থেকেই কিনা দিদিকে তোপ, 'তৃণমূল এবার নির্মূল হবে। পুরভোটে শুরু, বিধানসভা ভোটে শেষ।'

আর এক বহিরাগত আসছেন। শোনা যাচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাসে আসছেন। তাঁর নাম নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। গুজরাটের লোক দিল্লীকে দখল করেছে। তাঁর নেতৃত্বে একের পর এক রাজ্য পদ্মে ভরে যাচ্ছে। সেনাপতি অমিত শাহ ধর্মতলা ভরিয়ে যুদ্ধের ডাক দিয়ে গেলেন। তিনি আবার ব্রিগেড ভরাবার প্ল্যান নিয়ে আসছেন। সুতরাং দিদির এই বাংলার অনেক সঙ্কট। তাই আর দেরি নয়। আর বসে থাকা নয়। হাঁটুন, হাঁটুন, মিছিলে হাঁটুন। দিদি অনুগামীরা মিছিলে হাঁটুন। চলে যদি যেতেই হয়, হাঁটতে, হাঁটতে, হাঁটতে...

— **সুন্দর মৌলিক**

জমিয়তের সভার বিপুল খরচের হদিশ মিললেই সন্ত্রাসবাদের সূত্রটি প্রকাশ্যে আসবে

শনিবার, ২৯ নভেম্বর কলকাতায় শহিদ মিনার ময়দানে লক্ষাধিক মুসলমান জনতার মিছিলে প্রমাণ হলো যে পশ্চিমবঙ্গ আক্ষরিক অর্থেই বারুদের স্তূপে বাস করছে। এই মহামিছিলের ডাক দিয়েছিল জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ-এর নেতা জনাব সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যের সমস্ত বেআইনি মাদ্রাসাকে অবাধে চলতে দিতে হবে। সকলেই জানেন যে এইসব অবৈধ মাদ্রাসাগুলি আদতে ভারত-বিরোধী জঙ্গি কার্যকলাপের ঠেক। এখানে গরিব মুসলমান পরিবারের ছেলে মেয়েদের মগজ ধোলাই করে আত্মঘাতী জঙ্গি বানানোর তালিম দেওয়া হয়। সিদ্দিকুল্লা সাহেব এবং তাঁর সাঙাৎ মৌলানা মাদানির দাবি রাজ্যের বৈধ অবৈধ সমস্ত মাদ্রাসায় ইসলামের শিক্ষা দেওয়া হয়। তাই রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসাকেই স্বাধীনভাবে চলতে দিতে হবে। সিদ্দিকুল্লা ক্ষিপ্ত, কারণ খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পর বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থা কিছু অবৈধ বা খারিজি মাদ্রাসাকে ভারত-বিরোধী সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘরের তকমা দেয়। লক্ষাধিক মুসলমানের সমাবেশ করে সিদ্দিকুল্লা—মৌলানা মাদানিরা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তাঁরা ভবিষ্যতে 'ইসলাম বিপন্ন' ডাক দিয়ে সশস্ত্র দাঙ্গা শুরু করতেও পিছপা হবেন না। তার নমুনাও জমিয়তের অনুগামীরা কলকাতার রাজপথে শনিবার দেখিয়েছে তাদের লাঠি আর ইঁটের ঘায়ে ১০ জন পুলিশ অফিসার গুরুতর জখম হয়েছেন। একটা সময় পুরো শহিদ মিনার ময়দান এলাকাটি মুসলমান দুষ্কৃতীদের অবাধ মুক্তাঞ্চল হয়ে যায়। হবে নাই-বা কেন? সিদ্দিকুল্লা সাহেব মঞ্চ থেকে উস্কানি দিচ্ছেন এই বলে যে নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর বিজেপি সরকার ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র করতে চাইছেন। ভারতে হিন্দুরা প্রাধান্য পেলে ইসলাম ধর্ম সঙ্কটে পড়বে। তাই কিছুতেই এই দেশকে হিন্দুরাষ্ট্র হতে দেব না।

গূঢ়পুরুষের

কলম

সিদ্দিকুল্লা সাহেবের দাবি, অনুগামীদের কলকাতায় আনতে সাত হাজার বাস, ট্রাক ও ছোট গাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। প্রশ্নটা ঠিক এখানেই। এই বিপুল খরচের টাকাটা জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ কোন সূত্র থেকে সংগ্রহ করেছে। টাকার সূত্রটিকে টানলেই মুসলমান সন্ত্রাসবাদের সূত্রটি প্রকাশ্যে আসবে। খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পরেই বর্ধমান শহরে সিদ্দিকুল্লারা 'মাদ্রাসা বাঁচাও' দাবিতে মিছিল করেছিল। নন্দীগ্রাম আন্দোলনেও সিদ্দিকুল্লার জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ তৃণমূলের বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিল। পরে ক্ষমতায় এসে তৃণমূল নেত্রী সিদ্দিকুল্লাকে মন্ত্রী না করায় অভিমানে তিনি তৃণমূলের বিরোধী হন। কলকাতায় শনিবারের মুসলমান সমাবেশে সকলেই নামাজি টুপি পরে এসেছিল। মাদ্রাসা বাঁচাওয়ের নামে সকলেই এক সুরে হিন্দু-বিরোধী ধর্মীয় জিগির তুলছিল। বক্তারা মঞ্চ থেকে গলার শিরা ফুলিয়ে বোঝাচ্ছিলেন নরেন্দ্র মোদীর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার হিন্দু কর্তারা মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করছেন। এই রাজ্যে বিজেপি-র উত্থানে সিদ্দিকুল্লারা যতটা ভয় পেয়েছেন ততটায় ভীত তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সম্প্রতি পুলিশ ও প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন আর এস এসের শাখাগুলির উপর কড়া নজরদারি চালানোর। নেত্রীর কাছে খবর আছে শাখাগুলিতে স্বয়ংসেবকদের লাঠিখেলা শেখানো হয়। বোধহয় পাগলেও এমন চিন্তা করে না। স্বয়ংসেবকদের উপর নজরদারি অতীতে বহুবার হয়েছে। তাতে ক্ষতি তো হয়নি, উল্টে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃণমূল নেত্রী যত খুশি নজরদারি চালান, শাখার কাজকর্ম তার নিয়মেই চলবে। পুলিশের ভয় দেখিয়ে স্বয়ংসেবকদের মনোবল ভাঙা যায় না। বরং চিটফান্ডের অবৈধ টাকা যারা আত্মসাৎ করে তাদেরই ভয়টা বেশি। সততার প্রতীক তৃণমূল নেত্রী যে রাজ্যের বড় বড় চিটফান্ডের পাণ্ডা এখন তা আর অজানা নেই। এমনকী তিনি চিটফান্ডের টাকার জোরে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার খোয়াব দেখেছিলেন। এখনও লুঠের টাকায় সেকুলার ফেডারেল ফ্রন্ট গড়ার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু স্বপ্ন আর বাস্তব এক নয়। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরছে। দলের নেতা-নেত্রীরা মুখ খুলছেন। যেমন, তমলুকের তৃণমূল সাংসদ শুভেন্দু অধিকারী প্রকাশ্যে বলেছেন দলের ভিতর দিদির স্তাবকতা না করলে অবাঞ্ছিত হতে হয়। তোষামোদই এখন দলের একমাত্র রাজনৈতিক আদর্শ। এমন একটি দলের নেত্রী যিনি আদর্শবাদী স্বয়ংসেবকদের ভয় পাবেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

পশ্চিমবাংলার ক্রান্তিকাল : সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের শ্মশানযাত্রা

দেবব্রত ঘোষ

এ কোন বাংলা! এতো বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-নেতাজী-শ্যামাপ্রসাদের বাংলা নয়, যে বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রামে ফাঁসির মঞ্চে সবচেয়ে বেশি শহীদ দিয়েছে শুধু নয়, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক অগ্রাভিযানে মহানায়কের ভূমিকা পালন করেছে। এতো জগদীশচন্দ্র বসু-প্রফুল্ল রায়-সত্যেন বসু-মেঘনাদ সাহার বাংলা নয়, যে বাংলা একসময় বিজ্ঞানচর্চায় সারা ভারতের পথিকৃৎ ছিল। আজকের এই পশ্চিমবাংলা জুড়ে এখন শুধু মাস্তানরাজ, গণধর্ষণ, নারীনিগ্রহ, শিশুদের যৌনহেনস্থা, ক্রমবর্ধমান বেকারি, একের পর এক কলকারখানার বন্ধ হয়ে যাওয়া। কর্পোরেশন-মিউনিসিপ্যালিটি-পঞ্চায়েতের দুর্নীতি, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ইসলামি মৌলবাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার বাতাবরণ। অর্থের অভাবে রাজ্যে উন্নয়মূলক প্রকল্পের রূপায়ণ বন্ধ। বিভিন্ন কলেজ থেকে অতিথি অধ্যাপক- অধ্যাপিকা ছাঁটাই, রাস্তায় নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্তের সামর্থ্যের উপযোগী বাসের অভাব (বদলে তিনগুণ বেশি ভাড়া দিয়ে বাতানুকূল বাসে চাপতে হয়), শিক্ষাক্ষেত্রে টিএমসিপির নৈরাজ্য, স্বাস্থ্য পরিষেবা বেহাল। নেতা-মন্ত্রীরা কিন্তু বহাল তবিয়তে আছেন।

বিজেপিকে অশালীন ভাষায় অগণতান্ত্রিক আক্রমণ—একটি টেলিভিশন চ্যানেল (High News) ১১ নভেম্বর ২০১৪ রাত্রিবেলা একটা অনুষ্ঠান করছিল যেখানে ফোন করে দর্শকরা সরাসরি ওই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক বর্ষীয়ান সাংবাদিক জয়ন্ত চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলতে পারছিলেন। সকালে একটা সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবাংলার বিজেপি পর্যবেক্ষক সিদ্ধার্থনাথ সিং জামাত, সারদা গ্রুপ ও তৃণমূলের একাংশের যোগাযোগের সম্ভাবনার কথাটা উল্লেখ করেছিলেন অত্যন্ত সংযত ভদ্র ভাষায়, শালীনতা বজায় রেখে। ব্যাস, আর যায় কোথায়! রাত্রে টিভি চ্যানেলে (High News) দর্শকরা ফোন করে সিদ্ধার্থনাথ সিং-এর শ্রাদ্ধ করা শুরু করে দিলেন। বোঝাই গেল ওই টিভি চ্যানেলটা, অন্তত ওই দিনটার জন্য, সিদ্ধার্থনাথ সিং, নরেন্দ্র মোদী-সহ বিজেপি দল ও বিজেপি সমর্থকদের পিণ্ডি চটকানোর জন্য অপেক্ষমান ছিল। যাঁরা ফোন করছিলেন তাঁদের ব্যবহৃত শব্দ ও ভাষা বলে দিচ্ছিল তাঁরা অবশ্যই তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থক এবং ভারতবর্ষ বা পশ্চিমবাংলার নিরাপত্তার চাইতে মুসলমানদের নিরাপত্তা তাঁদের কাছে সবার আগে। সেদিনও তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়, বেচারাম মান্না ও ফিরহাদ হাকিম শালীনতা ও সংযমের সীমানা অতিক্রম করে বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদীর ঝাঁটা হাতে সড়ক পরিষ্কারের (স্বচ্ছ ভারত অভিযান) ঘটনাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন। কিন্তু আজ অবধি সিদ্ধার্থনাথ সিং বা নরেন্দ্র মোদী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি একটাও অশালীন শব্দ প্রয়োগ করেননি।

তৃণমূল কংগ্রেস কী করছে---শাসকদল রাজ্যের জনগণের টাকা নয়ছয় করছে যার নির্লজ্জ উদাহরণ কোটি কোটি টাকা খরচ করে কলকাতায় ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। শুধু ৩০ কোটি টাকা সরাসরি খরচ করা হচ্ছে তাই নয়, রাজ্যের শাসকদলের একান্ত কাছের একটা প্রযোজক গোষ্ঠীকেও কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে যার জন্য সরকারের আরও প্রায় ১৬ কোটি লোকসান। যেখানে রাজ্যের ঘাড়ে বিপুল দেনা সেখানে ৪৬ কোটি টাকা খরচ করে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করা দরকার ছিল না। যাঁদের জন্মদিন এ রাজ্যের শাসককুল ঘটা করে পালন করে, যেমন রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ; ইদানীং নবী দিবসও পালিত হচ্ছে, তাঁরা কী এই অকারণ অপচয় মেনে নিতেন? শাসকদলের ছোট-মাঝারি- বড়ো মাপের নেতারা সাধারণ মানুষবর্জিত ও চাটুকার পরিবৃত বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন। শাসকদল রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হিসেবে চিত্রাভিনেতা শাহরুখ খানকে প্রজেক্ট করে থাকেন। শাহরুখ খান আই পি এল নামক ক্রিকেট সার্কাস থেকে কোটি কোটি টাকা কামিয়ে নিয়ে যান। কলকাতা নাইট রাইডারের ক্রিকেটারদের দামি হীরের আংটি উপহার দিয়ে থাকেন রাজ্য সরকার, অথচ এ রাজ্যের উন্নয়নে শাহরুখের অবদান কিছুই নেই। অর্থাভাবে অসংখ্য উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ অথচ রমরম করে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল চলে, আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, ও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষেরা দামি গাড়ি চেপে দামি ভূষণে ভূষিতা হয়ে আলোকোজ্জ্বল প্রেক্ষাগৃহে দেশিবিদেশি ফিল্ম দেখে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলেন।

তুঘলকি রাজের পুনরাবির্ভাব---সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেশন কার্ডের রঙও সাদা নীল করা হবে অর্থাৎ আরও বেশ কিছু টাকার অকারণ অপচয় যা রেশন কার্ডধারীদের সত্যতা বা ভারতীয়ত্ব নির্ধারণে কোনো সাহায্য করবে না, কোনো সুবিধেও হবে না। শুধুমাত্র একটি দলের সর্বোচ্চ নেত্রীর ব্যক্তিগত পছন্দকে মূল্য দিতে গিয়ে গুচ্ছের টাকার অপব্যয়। পৃথিবীতে কোথাও সংখ্যালঘু ভবন বলে

কিছু হয় না। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চাইলেন তাই সরকার রাজ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য একটা সংখ্যালঘু ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। সরকারি তহবিল থেকে একটি মাত্র সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য সংখ্যালঘু ভবন নির্মাণের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী কী বার্তা দিতে চাইলেন রাজ্যের মুসলমানদের প্রতি! শুধুমাত্র সংখ্যালঘু প্রীতিই যদি একমাত্র কারণ হয়ে থাকে তাহলে জৈন, বৌদ্ধ, পারসিক, খৃস্টান, শিখ বা অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের জন্যও পৃথক পৃথক সংখ্যালঘু ভবন স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন না কেন? সম্ভবত ভোটের হিসেবটা মাথায় রেখেই এ ধরনের সস্তা চটকদার পরিকল্পনা গৃহীত হয় যা আখেরে বিভেদের বীজটাকে পরিবর্ধিত হতে সহায়তা করে।

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে—মালদহের ইংরেজ বাজারে এক মহিলা ধর্ষিতা হলেন আর ধর্ষণের বিচার চেয়ে থানায় অভিযোগ করতে যাওয়ার অপরাধে ধর্ষিতার বাবা ধর্ষকের হাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে। লোহার রড দিয়ে ধর্ষিতার বাবার চোখে উপড়ে নেবার চেষ্টা করেছিল ধর্ষক। ধর্ষিতার বাবার ছবি আমরা টেলি- মিডিয়ায় দেখেছি। এ রাজ্যের মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরি সরাসরি বলে দিলেন কোনো ধর্ষণই ঘটেনি। আরেক মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় টেলি-মিডিয়ার সামনে বলে দিলেন এগুলো ছোটখাটো বিচ্ছিন্ন ঘটনা। বাস্তব চিত্র হলো থানার ভেতরে সালিশির মাধ্যমে মিটিয়ে নেবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ১১ হাজার টাকার লেনদেনের বিনিময়ে। এ রাজ্যে এখন এটা একটা সাধারণ ঘটনা। তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার আগেই একজন মন্ত্রী কীভাবে এধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য প্রকাশ করেন?

কিছুদিন আগে বর্ধমান জেলার কাটোয়াতেও একই ধরনের ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল এবং সেখানেও শাসকদল একই আঙ্গিকে ধর্ষণের ঘটনাটিকে মিথ্যে বলে রটনা করেছিল।

পার্ক স্ট্রিট গণধর্ষণের ঘটনাকেও শাসকদল উপেক্ষা করেছিল এবং তৎকালীন ডিসি দময়ন্তী সেনকে বদলি করে দেওয়া হয়েছিল। কারণ ওই পুলিশকর্তা শাসকদলের অনুশাসন মেনে চলতে চাননি। ধুপগুড়িতে যে বালিকাটি ধর্ষিতা এবং পরবর্তী সময়ে খুন হয়েছিল সেই সম্পর্কে জেলা তৃণমূলের ওপর মহলের নেতারা বলেছিলেন মেয়েটার পরিবার সিপিএম করত তাই এই ঘটনার জন্য কোনরকম দুঃখপ্রকশ তাঁরা করবেন না। তৃণমূল জামানায় এই ধর্ষণ, শিশুধর্ষণ, গণধর্ষণ এখন নিত্যঘটনা যা আমাদের বামজমানার কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

শিক্ষায় দলতন্ত্র ও স্বজনপোষণ—পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক বা অ্যাসিসটেন্ট প্রফেসার নিয়োগের ক্ষেত্রে (২০১২-২০১৪) ব্যাপক অনিয়ম, বেনিয়ম, স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে ও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ইউ জি সি'র নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, তুলনামূলকভাবে অনেক কম যোগ্য প্রার্থীদের বিভিন্ন কলেজে, বিভিন্ন বিষয়ে, সহকারী অধ্যাপক বা অ্যাসিসটেন্ট প্রফেসার পদে চাকরি দেওয়া হয়েছে এবং রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ প্রার্থীরাই এই সুযোগটা পেয়েছেন। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে একই প্রার্থী জেনারেল ক্যান্ডিডেট হিসেবে অ্যাসিসটেন্ট প্রফেসারদের প্যানেলে নথিভুক্ত হয়েছেন, আবার সংরক্ষিত ক্যান্ডিডেট হিসেবেও (SC) প্যানেলভুক্ত হয়েছেন। আবার physically handicapped ক্যান্ডিডেট হিসেবেও প্যানেলভুক্ত হয়েছেন। যার ফলে বহু যোগ্য জেনারেল প্রার্থী প্যানেলে চান্স পাননি। মেধা নয়, ওপরমহলে যোগাযোগটাই ছিল এবারের পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন পরিচালিত ইন্টারভিউয়ের শেষকথা। প্রার্থীদের মার্কসশিটে কারচুপি করা হয়েছে এবং অধিকতর শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বহু প্রার্থীকে বাদ দিয়ে কম যোগ্য প্রার্থীকে প্যানেলভুক্ত করা হয়েছে তাদের শাসকদলে কার কতটা contacts & connnections আছে সেই ভিত্তিতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের একটা পদ্ধতি ছিল যেখানে একাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদরা যৌথভাবে উপাচার্য নির্বাচন করতেন। আজ দেখা যাচ্ছে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী নিজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করতে চলেছেন, হয়তো দলের সর্বাধিনায়িকার এটাই নির্দেশ। এরপরেও কি বলতে হবে রাজ্যে শিক্ষাজগতে গণতন্ত্র রয়েছে? শিক্ষাঙ্গণে শিক্ষা, মূল্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধের চিতা রচিত হয়েছে, সেই চিতার আগুন থেকে জন্ম নিয়েছে নৈরাজ্য, স্বৈরাচার আর চূড়ান্ত এক স্বৈরবৃত্ত কালের পাশবিকতা যা চক্ষুষ্মান রাজনৈতিক চেতনাকে আবৃত করেছে দলতন্ত্রের নির্লজ্জ মুখোশে। এটাই আজকের পশ্চিমবাংলা।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকার একটা নতুন সার্চ কমিটি গঠন করতে চলেছে যে সার্চ কমিটি প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদের জন্য ৩টি করে নাম পাঠাবে এবং রাজ্যপাল ওই ৩টি নামের থেকেই একটা নাম নির্বাচন করতে পারবেন অর্থাৎ বকলমে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী একাই হবেন রাজ্যের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের একমাত্র অধিকারী। রাজ্যপালের নির্বাচিত প্রার্থীকে শিক্ষামন্ত্রীর মনোনয়ন ও অনুগ্রহ পেতেই হবে।

শিক্ষাদপ্তরের সর্বোচ্চ পদে যিনি বসবেন তিনি একটি রাজ্যের ক্ষমতাসীন শাসককুলের অনুগ্রহভাজন হবেন যেটা তার যোগ্যতার প্রধান মাপকাঠি—এই সরকারি তথা দলতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে অন্তিমযাত্রায় পাঠিয়ে দেবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। ■

কংগ্রেস নয়, কংগ্রেসী চিন্তন মুক্ত দেশ গড়াই এখন বড়ো চ্যালেঞ্জ

সাধন কুমার পাল

বিগত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী কংগ্রেস মুক্ত ভারত গড়ার ডাক দিয়েছিলেন। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ও পরে অনুষ্ঠিত মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানার বিধান সভার ফলাফলে কংগ্রেস মুক্ত ভারতের প্রবণতা স্পষ্ট। স্বাধীনোত্তর ভারতে কংগ্রেসী অপশাসনের উপজাত হিসেবে সৃষ্ট জনতা দল-সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক দল ও কমিউনিস্ট তকমাধারী দলগুলির কংগ্রেসের সঙ্গে সহমরণে যাওয়ার অবস্থা। ক্ষমতা হারাতে থাকা দলগুলি এই ঘটনাকে নির্বাচনী রাজনীতিতে ঘটে চলা একটি সাধারণ ক্ষমতা বদলের ঘটনা হিসেবেই চিহ্নিত করবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিভিন্ন তথাকথিত 'অসাম্প্রদায়িক', 'প্রগতিশীল' তকমা-প্রাপ্ত দল মুছে গিয়ে যে ভাবে 'হিন্দুত্ববাদী-সাম্প্রদায়িক' দলের তকমা-প্রাপ্ত বিজেপি-র উত্থান ঘটছে তাতে এই পরিবর্তনকে কি গণতন্ত্রের নিয়মে একটি নিয়মমাফিক রাজনৈতিক ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করা যাবে?

আমার মনে হয় ইতিহাসের পথ ধরে 'আদর্শের লড়াই', 'কংগ্রেসী চিন্তনশৈলীর পরিবর্তনের লড়াই', 'বিপন্ন হয়ে পড়া ভারত আত্মার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই'— এরকম দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে বিজেপি-র এই উত্থান রহস্যের একটি স্বাভাবিক এবং সময়ের অপেক্ষা মাত্র ঘটনা হিসেবে স্পষ্ট ও সাবলীল ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। এবং এই বিশ্লেষণ সবচেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য মনে করলে বলতে হবে কংগ্রেসী চিন্তনশৈলী থেকে ভারতকে মুক্ত করার লড়াই এতদিন সুপ্ত ভাবে চললেও এই নির্বাচন দিয়ে সেই দীর্ঘস্থায়ী লড়াইটির প্রকাশ্য সূচনা হলো মাত্র। কারণ দল হিসেবে কংগ্রেসের রাজনৈতিক অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন হলেও কংগ্রেসী চিন্তনশৈলীর মূল অনেক গভীরে প্রোথিত।

ইতিহাস বলছে কংগ্রেসের সৃষ্টি লগ্ন থেকেই অনেক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিও কংগ্রেসের এই চিন্তনশৈলীর সঙ্গে এক মত হতে না পেরে চিন্তা ও তৎপরতার এই ধারা থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখে দেশমাতৃকার সেবার জন্য নিজেদের মতো করে এক স্বতন্ত্র কাজের ধারা শুরু করেছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর বারো বছর পর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত (১৮৮৫) হয়েছিল। রামমোহনের কংগ্রেসে যোগদানের প্রশ্ন ওঠে না। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বন্দেমাতরম্ ও আনন্দমঠের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে কলকাতায় দু'বার কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল। দু'টোর কোনোটাতেই বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন না। কংগ্রেসের অধিবেশনে তৎকালীন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ব্যক্তিত্ব আমন্ত্রিত হবেন এটা ধরে নেওয়া যায়। তাছাড়া এমনও নয় যে বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় রাজনৈতিক আদর্শবাদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না বা কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কারণ ইতিহাস বলছে তিনি ইংরেজ ও উচ্চবিত্ত ভারতীয়দের সংগঠন বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। কংগ্রেস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য, 'উহা (কংগ্রেস) সাধারণ মানুষের সম্পত্তি হয় নাই।'

১৮৯৬ সালে কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসেছিল। সে সময় নেতৃস্থানীয় কয়েকজন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করে কংগ্রেসকে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করেছিলেন। উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন 'সমস্ত মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এই দুটি অধিকার পাবার জন্য যদি আপনারা লড়াই করেন আমি থাকব।' এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট যে দেশের বুনিয়াদি প্রয়োজনগুলি সম্পর্কে সৃষ্টিলগ্ন থেকেই কংগ্রেস সচেতন ছিল না।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন।

কংগ্রেসী চিন্তনশৈলী নামক ভাবনার বিষে আজ ভারতের অন্তরআত্মা যেন বিষিয়ে উঠেছে। এই চিন্তনশৈলীর সঙ্গে সহমত হতে না পারার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। দেশের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে মানুষের হৃদয় মন্দিরে পূজিত হয়েও উপযুক্ত মর্যাদা পাননি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও দীর্ঘ সময় কারাবন্দী থাকতে হয়েছে বীর সাভারকারকে।

তৃতীয় অধিবেশনে (১৮৯৬) উদ্বোধনী সঙ্গীতও পরিবেশন করেছিলেন। সে সময় কবিগুরু কম বয়সের ছিলেন। এর বছর দশক বাদে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী জনআন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশ নিলেও কংগ্রেসের সদস্য পদ গ্রহণ করেননি। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর একজন বিবেকবান দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে আন্দোলনের অঙ্গনে এসেছিলেন। বয়কট স্বদেশী আন্দোলন পর্বে দেশের রাজনৈতিক চেহারা সম্পর্কে হতাশা কবিগুরুর লেখাতে ফুটে উঠেছে। ১৯২২ সালে আত্মশক্তিতে তিনি লিখেছেন--- ‘‘আমাদের দেশে জেলে যাইবার জন্য যতলোক যে ভাবে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহাদের শতাংশের এক অংশও পাওয়া যায় না আজ গ্রামে গিয়া কাজ করিবার জন্য।’’ একটি জায়গায় তিনি কংগ্রেস সদস্যদের সম্পর্কে লিখেছেন ‘‘ওই চার আনার বাবুরা আসছে।’’

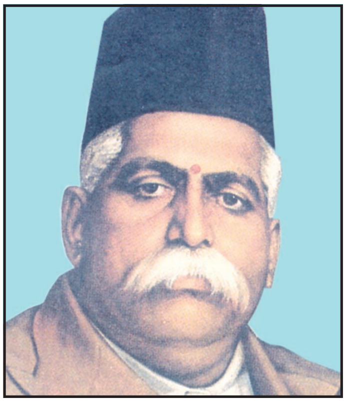

ডা: হেডগেওয়ার

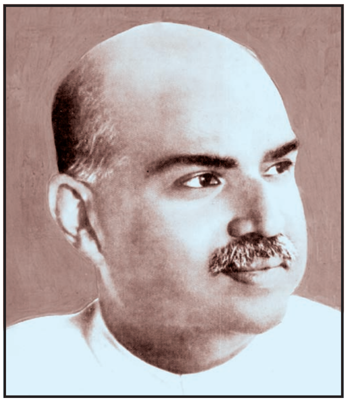

ড. শ্যামাপ্রসাদ

সাভারকর

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বাঙালির অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলা-সহ নানা সামাজিক ক্রিয়াকলাপে যুক্ত থাকলেও কোনোদিন কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘নাইটহুড’ ত্যাগ করলেও কংগ্রেসের অনুরোধ সত্ত্বেও আচার্য রায় নাইট খেতাব ত্যাগ করেননি। সে সময় ৫১৮৬ জন নাইট খেতাবধারীর মধ্যে মাত্র ২৪ জন কংগ্রেসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই খেতাব ত্যাগ করেছিলেন।

বিবেকানন্দের কথায় আসা যাক। আমেরিকা বিশ্ব ধর্মসভা সেরে থেকে ফেরার পর স্বামীজীকে ঘিরে উচ্ছ্বাস উন্মাদনা আর অভিনন্দনের ঢল নেমেছিল। সেই দলে ছিলেন কংগ্রেসের লোকেরাও। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে স্বামীজী তাঁদের বলেছিলেন, ‘দেশ স্বাধীন হলেও দেশ চালানোর লোক তৈরি হয়নি। লোক তৈরি না হলে দেশ চালাবে কে?’ বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা অশ্বিনী দত্ত স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘কংগ্রেসের কাজকর্মে কী আপনার আস্থা নেই?’ কোনো রাখঢাক না করেই স্বামীজী উত্তর ছিল, ‘না, তা নেই, তবে নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।’ ১৯০০ সালে দেশের কিছু অঞ্চল দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়ে পড়েছিল। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে স্বামীজী অখণ্ডানন্দজীকে লিখছেন, ‘...এই দুর্ভিক্ষ, বন্যা, রোগ, মহামারীর দিনে কংগ্রেসওয়ালারা কোথায় বলো? খালি আমাদের হাতে রাজ্য শাসনের ভার দাও বললে কি চলে? কে-বা শুনছে ওদের কথা?’ আরেকটি জায়গায় স্বামীজী বলেছেন, ‘...আমাদের নির্বোধ যুবকগণ ইংরেজগণের নিকট হইতে অধিক ক্ষমতা লাভের জন্য সভাসমিতি করিয়া থাকে--- ইহাতে ইংরেজরা হাসে। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোনো মতেই স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য নয়। দাসেরা শক্তি চায় অপরকে দাস করিয়া রাখিবার জন্য’। আরো আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এক জায়গায় স্বামীজী বলেছেন, ‘...কোথাও কিছু নেই, কেবল কংগ্রেস করে চেঁচামেচি করলে কী হবে? ...ভারতের লোকগুলো কংগ্রেস কংগ্রেস করে মিছিমিছি হৈচৈ করছে কেন? কতকগুলো হাউরে লোক এক জায়গায় জুটে কেবল গলাবাজি করলেই কি কাজ হয়?’ একটি তথ্য বলছে, ১৮৮৫ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত কংগ্রেসের আঠারোটি অধিবেশনের বারোজন ভারতীয় সভাপতির মধ্যে ছয়জনের সঙ্গে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। এ ছাড়া আরো বহু কংগ্রেস নেতার সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। স্বামীজীর মতো অরবিন্দ ঘোষেরও কংগ্রেস সম্পর্কে ধারণা ভালো ছিল না। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনকে অরবিন্দ ঘোষ ‘Three days tamasa’ বলে উল্লেখ করেছিলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতো সে সময়ের অনেক মহীরুহই কংগ্রেসকে এড়িয়ে চলতেন।

বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর বা রবীন্দ্রনাথের মতো কংগ্রেস সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য করেছেন এরকম দৃষ্টান্ত না থাকলেও মহারাষ্ট্রের ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি থেকে অচ্ছেদ্য ‘হিন্দু চিন্তন শৈলী’র পুনর্জাগরণ ঘটিয়ে চরিত্রবান দেশপ্রেমিক মানুষ তৈরির মাধ্যমে রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের জন্য ১৯২৫ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নীরব কাজ শুরু করেন। কংগ্রেসী চিন্তনশৈলী থেকে ভিন্ন ধারার প্রতিষ্ঠান স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন ও

রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের পথ চলাও সেই পরাধীন ভারতবর্ষেই শুরু হয়েছিল। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে ভারতীয় সমাজের এমন কোনো জায়গা বোধহয় আজ বাকি নেই যেখানে সঙ্ঘ এবং সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা উপস্থিত নেই।

এবারের নির্বাচনে ভারতীয় জনতাপার্টি দেশের এক নম্বর রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে উঠে এসে একক শক্তিতে কেন্দ্রের সরকার গঠনের ক্ষমতা অর্জন করে হইচই ফেলে দিলেও সঙ্ঘ ভাবাদর্শের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের এক নম্বর হওয়ার জয়যাত্রা শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। যেমন, সরকারি ঘোষণা অনুসারে ১৯৯৬ সাল থেকে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ দেশের সবচেয়ে বড় শ্রমিক সংগঠন। বিদ্যাভারতীর মতো এত বড় বেসরকারি শিক্ষা সংগঠন ভারত কেন সমগ্র বিশ্বে নেই। বনবাসী ক্ষেত্রে কর্মরত বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের মতো এত বড় সংগঠন আর নেই, ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিশ্বহিন্দু পরিষদ, ছাত্র সংগঠন হিসেবে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, শিক্ষক সংগঠন হিসেবে অখিল ভারতীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের মতো আরো বেশ কিছু সংগঠন আছে যারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সমগ্র দেশে প্রভাব ও সংখ্যাতত্ত্বে এক নম্বর জায়গা দখল করে নিয়েছে। এছাড়াও চিকিৎসা ক্ষেত্রে আরোগ্য ভারতী, ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভারতী, আইনের ক্ষেত্রে অধিবক্তা পরিষদ, কৃষিক্ষেত্রে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের মতো অনেক সংগঠনই আজ প্রভাবশালী সংগঠন হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতের মতো বহুত্ববাদী দেশে হিন্দুত্বকে ভিত্তি করে দেশ গড়ার প্রয়াস কেন? কেন কংগ্রেসের আমদানি করা ধর্মনিরপেক্ষতা নয়? এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে ভারতের সব রকম শুভনীতি, পরমত ও পরধর্ম সহিষ্ণুতার মতো সমস্ত রকমের মূল্যবোধের উৎস হচ্ছে হিন্দুধর্ম। জাতিবাচক, সভ্যতাবাচক 'হিন্দু' শব্দটি প্রত্যেক সমভাবাপন্ন ধর্মমতের সার্বভৌমত্ব ও স্বকীয়তাকে অক্ষুণ্ণ রেখে সবাইকে একই সংস্কৃতিতে আবদ্ধ করে ভারতের সামগ্রিক সত্তাকে প্রকাশ করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু শব্দের মধ্যে দেখেছিলেন ভারতের জীবন দর্শন, ভারতীয় সংস্কৃতি-সহ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ প্রকাশ। স্বামীজী 'হিন্দু' শব্দের মধ্যে দেখেছিলেন 'ধর্ম' শব্দের পূর্ণ অভিব্যক্তি। স্বামীজীর ভাষায় 'আমি নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করিয়া থাকি।' ...'এখন ধর্ম ও হিন্দু— এই দুইটি শব্দ একার্থ বাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই ক্ষমতাসম্পন্ন ভাবনা হিন্দুত্বকে কলুষিত করার যে কাজ ইংরেজরা শুরু করেছিল তা ধারবাহিকভাবে চলতে থাকে মেকলে সাহেবের ভাবশিষ্য ভারতীয় শাসক, শিক্ষাবিদ ও বিভিন্ন দলীয় মতবাদের হাত ধরে। দেশের মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হিন্দু শব্দের ভাব, ভাবনা ও বিশেষত্বকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত করে বহু ভাষা, সম্প্রদায়, উপাসনা পদ্ধতির এদেশের ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষার নিমিত্ত চাপিয়ে দেওয়া

> **"দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জওহরলাল নেহরুও হিংসায় বিশ্বাসী অভিযোগ তুলে ক্ষুদিরামের মূর্তিতে মালা দিতে অস্বীকার করেছিলেন। পরাধীন ভারতে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে দেশভাগ ডেকে এনেছিলেন। কাশ্মীর সমস্যা, দেশ জুড়ে অনুপ্রবেশ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, স্বাধীনতার পর দেশের সীমা সঙ্কুচিত হওয়া, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারি, বাসস্থান ইত্যাদি যাবতীয় সমস্যার দায়ও এই চিন্তনশৈলীকেই নিতে হবে।"**

আমাদের জাতির বিশেষত্ব। ইহাতে আঘাত করিবার উপায় নাই।'

এদেশে নিজেদের ঔপনিবেশিক শাসনকে চিরস্থায়ী করতে ইংরেজরা সর্বপ্রথম ভারতাত্মার প্রতীক হিন্দু ও হিন্দুত্বের উপর আক্রমণ শুরু করে। শুধুমাত্র খৃস্টান ধর্ম যাজকদের মাধ্যমে নয়, সরকারি বদান্যতায় মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেও এই আক্রমণ চলতে থাকে। তার ফলও আসে হাতেনাতে। সেসময় নাকি বলা হতো, গাধা বলো সেও ভালো, হিন্দু বলো না। শিক্ষিত শ্রেণী ঝুঁকতে থাকে খৃষ্ট ধর্মের দিকে, প্রবর্তিত হয় ব্রাহ্ম ধর্ম। কংগ্রেসী চিন্তাশৈলীর হাত ধরে স্বাধীনোত্তর ভারতে বহুত্ববাদী বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করার স্বাভাবিক হলো এক ইউরোপিয়ান ভাব। যার পোশাকি নাম সেক্যুলারিজম'। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'ধর্মবিবর্জিত' আর চালু অর্থ 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটির প্রকৃত অর্থ— ধর্মের অপেক্ষা নেই, স্থান নেই, প্রয়োজন নেই। আবার এই শব্দটির চালু রাজনৈতিক অর্থ সবধর্ম সমভাব। সবমিলে বলা যায় সেক্যুলার শব্দটি দিয়ে কোনোভাবেই সমস্ত ধর্মকে সমমর্যাদা দান বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন বোঝায় না। 'সেক্যুলারিজম'-এর প্রবক্তাদের চোখে মুসলিম লীগের মতো মুসলমান সংগঠনগুলি 'ধর্মনিরপেক্ষ', যাদের সঙ্গে নির্বাচনের সময় জোট বাঁধা যায়, সরকারের অংশীদার বানানো যায় আর হিন্দুত্বের কথা

বলা সংগঠন হলেই সাম্প্রদায়িক। খুব সংক্ষেপে বললে বলতে হবে 'সেক্যুলারিজম' হলো এমন এক তত্ত্ব যা তোষণের রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে স্বাধীনোত্তর ভারতকে ভেতর থেকে এক সংগঠিত জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে দেয়নি।

বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এটা বোধ হয় বলা যায় সঙ্কীর্ণ ভোটের রাজনীতির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে হতে এদেশের ধর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে বেমানান সেক্যুলার শব্দটি ক্রমেই যেন শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। নেহরুর ১২৫তম জন্মশতবার্ষিকী পালনের অজুহাতে সোনিয়া গান্ধীর 'ধর্মনিরপেক্ষ' জোট গড়ার প্রয়াস ধাক্কা খাওয়া এ কথার বড় প্রমাণ। আগের মতো বুক ফুলিয়ে কেউ এই শব্দটি বলছেন বা লিখছেন এমনটা কমই দেখা যাচ্ছে। এমনও হতে পারে সেক্যুলার বন্ধুরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন এবং আবার নতুন কৌশলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। তবে হিন্দুত্বের আদর্শে দীক্ষিত বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনকে মানুষ যে ভাবে কাছে টেনে নিচ্ছে এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে তা থেকে এটা বলা যায় কংগ্রেসী চিন্তাশৈলী অর্থাৎ দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় 'সেক্যুলারিজম' নামক কংগ্রেস প্রবর্তিত বিদেশি রসায়নের বদলে 'হিন্দুত্ব' নামক স্বদেশি রসায়নের প্রতিস্থাপিত হওয়ার লক্ষণ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

গান্ধীজী মনে করতেন ইংরেজে আপত্তি নেই কিন্তু ইংরেজিয়ানা চাই না। জওহরলাল নেহরু ঠিক এর উল্টো মনোভাব পোষণ করতেন। নেহরু চাইতেন ইংরেজিয়ানা থাকুক কিন্তু ইংরেজ নয়। এদেশ গড়তে বিদেশি মডেলই ছিল জওহরলাল নেহরুর ধ্যান জ্ঞান। সে সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনীতিক ও প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর এই ধরনের মানসিকতার জন্যই মূলত দেশ পরিচালনায় স্বদেশী ভাব ভাবনা খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। রাজনীতি, শাসন নীতি, শিক্ষানীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্রেই বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন উন্নত সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক বাহক ভারতের নিজস্ব ভাবনাচিন্তাকে ভিত্তি করে এদেশকে গড়ে তোলার কোনো চেষ্টাই হয়নি।

একটু ঘষেমেজে ইংরেজের ছেড়ে যাওয়া জুতাতেই পা গলিয়ে স্বাধীনোত্তর ভারত চলতে শুরু করেছে। ফলে এখন বৃটিশের ভারত শাসন আইন নেই, রয়েছে তাদের আদলে তৈরি হওয়া সংবিধান। মেকলে সাহেব নেই, রয়ে গেছে মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এদেশে চালু রয়েছে মিশ্র অর্থ ব্যবস্থার নামে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ান মডেলের উপর বিভিন্ন দেশের থেকে ধার করা এক জগাখিচুড়ি অর্থব্যবস্থা। সর্বক্ষেত্রে বর্তমান ভারতের সঙ্কটময় পরিস্থিতির কারণ যে এই কংগ্রেসী চিন্তনশৈলীর মধ্যেই রয়েছে— এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সমাজতান্ত্রিক মডেলের অনুকরণে গড়ে ওঠা যোজনা কমিশন ভেঙে দেওয়া, সাংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনার মতো প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের গ্রামগুলিকে সমৃদ্ধ করার পরিকল্পনা, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, বিদেশ ও সুরক্ষা নীতিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, ইতিহাস মানেই গান্ধী পরিবার ও তার ঘনিষ্ঠদের ইতিহাস। এই ধারণার বাইরে এসে বল্লভভাই প্যাটেলের মতো ইতিহাস সৃষ্টিকারীদের তুলে ধরার প্রয়াসের মতো ঘটনাগুলিকে কংগ্রেসী চিন্তনশৈলী থেকে দেশকে বের করে আনার প্রয়াসের শুরু হিসেবেই দেখতে হবে।

শুনতে খারাপ লাগলেও এটা বোধহয় মানতেই হবে যে কংগ্রেসী চিন্তনশৈলী নামক ভাবনার বিষে আজ ভারতের অন্তরআত্মা যেন বিষিয়ে উঠেছে। এই চিন্তনশৈলীর সঙ্গে সহমত হতে না পারার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। দেশের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে মানুষের হৃদয় মন্দিরে পূজিত হয়েও উপযুক্ত মর্যাদা পাননি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও দীর্ঘ সময় কারাবন্দী থাকতে হয়েছে বীর সাভারকারকে। এমন দৃষ্টান্ত আরো অনেক দেওয়া যেতে পারে।

এই চিন্তনশৈলীর সহযাত্রী কমিউনিস্টদের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে 'বুর্জোয়া কবি' রবীন্দ্রনাথকে, প্রতিক্রিয়াশীল সন্ন্যাসী হিসেবে চিহ্নিত হতে হয়েছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে। কংগ্রেসী চিন্তনশৈলীর হিন্দু-বিদ্বেষী ভাবনার জন্যই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ হতে হয়েছে তিন তিন বার। কংগ্রেসী ঘরানার মমতা সরকারের শিক্ষা দপ্তর প্রকাশিত বইয়ে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম সন্ত্রাসবাদী আখ্যায় আখ্যায়িত হওয়ার এবং ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে গোপন রাজনৈতিক বোঝাপড়ার অভিযোগ উঠেছে। ইতিহাস বলছে, এই দুটো ক্ষেত্রেই মমতা তাঁর ছেড়ে আসা কংগ্রেসের নীতিকে অনুসরণ অনুকরণ করেছেন মাত্র। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জওহরলাল নেহরুও হিংসায় বিশ্বাসী অভিযোগ তুলে ক্ষুদিরামের মূর্তিতে মালা দিতে অস্বীকার করেছিলেন। পরাধীন ভারতে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে দেশভাগ ডেকে এনেছিলেন। কাশ্মীর সমস্যা, দেশ জুড়ে অনুপ্রবেশ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, স্বাধীনতার পর দেশের সীমা সঙ্কুচিত হওয়া, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারি, বাসস্থান ইত্যাদি যাবতীয় সমস্যার দায়ও এই চিন্তনশৈলীকেই নিতে হবে।

এবারের লোকসভা নির্বাচন ও সদ্য ঘটে যাওয়া কয়েকটি রাজ্যের বিধান সভা নির্বাচনের ফলাফল বলছে, রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে জাতীয় কংগ্রেসের স্রোতধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। এই ধারা সার্ধশতবর্ষে পৌঁছবে কিনা বলা মুশকিল। একই পরিস্থিতি কংগ্রেসী শাসনের উপজাত হিসেবে সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন আঞ্চলিক দল ও কমিউনিস্ট তকমাধারী দলগুলির। তবে ১৯২৫ সাল থেকে সঙ্ঘের নিরলস প্রয়াসের ফলে হিন্দুত্ববাদী চিন্তনশৈলী যে ভাবে পুনর্জাগরিত হচ্ছে তাতে অস্তিত্বের সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন দলকে চিন্তনশৈলীর পরিবর্তন ঘটিয়ে ভারতের এই নবজাগরণের স্রোতে গা ভাসানো ছাড়া উপায় আছে বলে মনে হয় না। ■

ধ্বংসের মধ্য থেকে নির্মাণ

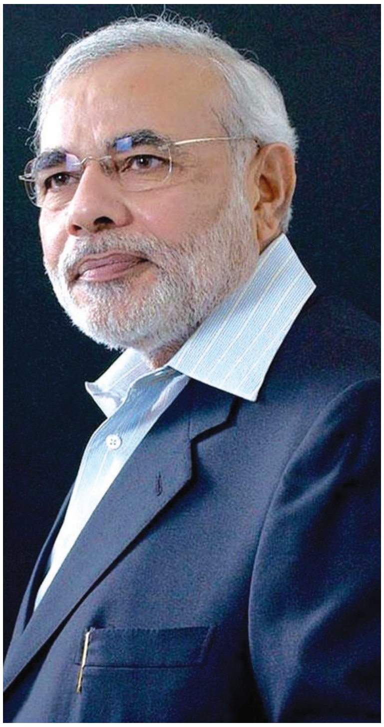

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

রোম সাম্রাজ্যে ক্রীতদাস প্রথা যখন তার অত্যাচারের চরম সীমায় পৌঁছেছিল তখন সেই মানুষদের নিয়ে বিপুল ক্ষমতাধর সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন স্পার্টাকাস (Spartacus)। পৃথিবীর ইতিহাসে স্পার্টাকাস পরিচালিত এই দাস বিদ্রোহের শেষে সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যের বহু মহার্ঘ স্মারকই ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছিল। নির্যাতিত জনতা স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে বিজয়ী হওয়ার পর রোমের কর্তা-ব্যক্তিরা উল্লসিত জনতাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তারা স্পার্টাকাসের সঙ্গে জান-প্রাণ বাজি রাখা এই লড়াই-এর সঙ্গী হয়ে কি পেল? স্পার্টাকাস তো সবই ধ্বংস করে ফেলেছে। সে নতুন কিছু তৈরিই করতে পারেনি বরং যা ছিল গর্বের তাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। উদ্বেল জনতা উত্তর দিয়েছিল সে কথা ঠিকই, কিন্তু স্পার্টাকাস যা নির্মাণ করেছে তা চোখে দৃশ্যমান না হলেও এক অমোঘ সত্য। সে হাজার হাজার হতদরিদ্র অত্যাচারিতের মনে জন্ম দিয়েছে আশার। উন্মেষ ঘটিয়েছে নতুন সৃষ্টি সম্ভাবনার। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর ৬ মাস কাটতে না কাটতেই রব উঠছে— কি হলো, কি পাওয়া গেল। আগের কথা ছেড়ে দিলেও সদ্য সমাপ্ত ১০ বছরের কংগ্রেসী জোট রাজত্বে যে স্বর্গসুখ ছিল তার অভাবেই হয়তো হতাশা!

মনে রাখতে হবে, নির্বাচনের আগে মোদী ডাক দিয়েছিলেন কংগ্রেসমুক্ত ভারতের। আক্ষরিক অর্থে সেই সন্ধিক্ষণে সেটা ছিল কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার থেকে দেশের মুক্তি। সেই প্রাথমিক অপসারণের কাজটি তিনি সম্পাদন করেছেন ভোটদাতাদের সঙ্গে নিয়ে। তাঁর এই যাত্রায় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় নানান রাজ্যে হরেক আঞ্চলিক দলের অধিপতিদের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার নড়বড়ে অভিলাষগুলি সেখানকার নির্বাচনী শ্মশানভূমিতে পড়ে আছে, যথা উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ (দিদির সংখ্যা বাড়লেও মূল স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে তাঁকে পাঁকে ডুবিয়ে দিয়েছে)। কংগ্রেসমুক্ত ভারত গড়ার পথে এটি প্রথম ধাপ। ৩০ বছর পর পূর্ণ গরিষ্ঠতার একদলীয় সরকার। আক্ষরিক অর্থে কংগ্রেসমুক্ত সরকার কথাটির প্রয়োগ অংশত করা যেতে পারে। কেননা কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার আর নেই। কিন্তু যে ভারতের রাজনীতি ৬৭ বছর ধরে কংগ্রেসকেন্দ্রিকতায় আবর্তিত তা কি রাতারাতি উবে যাবে? Colonial Hangover বলে বিষয়টির ওপর দেশে আজকাল বহু গবেষণা হচ্ছে। পূর্বতন শাসক বৃটিশের আচার ব্যবহার, তার আমলাতন্ত্র, তাদের আচরণ, শিক্ষায়, ভাষায় পোশাকে, আহার্যে যে বিস্তারিত উপনিবেশিক উত্তরাধিকার রেখে গেছে তা কি পুরোপুরি বিনষ্ট হয়েছে? বিদেশি শাসকের শারীরিক উপস্থিতি নেই কিন্তু তার হ্যাংওভার বা খোঁয়াড়ি অংশ এখনও বিদ্যমান। ৬৭ বছরে দেশবাসী শাসনক্ষমতা পেলেও দেশের শীর্ষ শাসনকর্তারা ইংরেজের ব্যবস্থাটিকে সেভাবে ঝেড়ে ফেলেননি। বরং কংগ্রেস তৈরি করেছিল ওই মোড়কেই তাঁর নিজস্ব ঘরানার রাজনীতি। যার প্রধান চিহ্ন পরিবারবাদ। রাজার অযোগ্য ছেলেও রাজাই হবে। বৃটিশ অনুসৃত নীতিতে এক বিপুল আমলা বাহিনী যা অনেক ক্ষেত্রেই কায়েমি স্বার্থের দোসর হয়ে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে দিয়েছে তাও ছিল অটুট। ঢালাও দুর্নীতির দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকা এক আখের গোছানো সরকার ছিল নামেই। দলের শাসিত রাজ্যগুলি তাদের আঞ্চলিক প্রয়োজন উপেক্ষা করে দিল্লীর অঙ্গুলিহেলনে বশংবদ, কিন্তু দুর্নীতিতে পারদর্শী। যেন কেন্দ্র এ ব্যাপারে ধৃতরাষ্ট্র। তাই কংগ্রেসমুক্ত ভারত এক বহুমাত্রিক স্লোগান। আজকে যে 'স্বচ্ছ ভারত', 'জন ধন যোজনা' 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রভৃতি সাড়া ফেলছে তা সবই কংগ্রেসমুক্ত ভারত ভাবনার এক প্রসারিত রূপ। একে অপরের পরিপূরক।

স্বচ্ছ ভারত অর্থে কেবল জঞ্জালমুক্ত ভারত নয়, দুর্নীতিমুক্ত ভারতও বটে। একটি উদাহরণ দেখুন, ভরতুকির যে টাকা যোগ্য প্রাপকের হাতে যাওয়ার পথেই অন্য পকেটে চলে যাচ্ছে তা আর পথভ্রষ্ট হবে না। জন ধন প্রকল্পে সবারই মাত্রা থাকবে। মন্ত্রিসভা গঠনের শুরুতেই বৃদ্ধ অতি বৃদ্ধ হলেও পরম্পরাগত ভাবে মন্ত্রিত্ব ভোগ করার বন্দোবস্তকে নস্যাৎ করা সোজা ব্যাপার নয়। এটি অসম্ভব গুরুত্বের প্রারম্ভিক অভ্যন্তরীণ সংস্কার। কংগ্রেসী হ্যাংওভার থেকে মুক্তি পাওয়ার দুঃসাহসিক সোপান। মাপছাড়া ভাবে দ্রুত নানান পরিকল্পনার যাদের অনেক কিছুই লাগু হতে শুরু করেছে তার কিছু ঝলক দেখা যেতে পারে। যেমন সম্পূর্ণ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত দেশের প্রতিরক্ষার মতো দপ্তরে চুরির আশঙ্কায় পর্যাপ্ত সরঞ্জাম কেনাই অ্যান্টনি সাহেব বন্ধ করে দিয়েছিলেন। নিরাপত্তা ছিল গৌণ। বিদেশি চুক্তিগুলির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনার সঙ্গে ভারতের লার্সেন অ্যাণ্ড টুবরো, টাটা প্রভৃতি স্বনামধন্য কোম্পানিগুলিকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে। এগুলি সবই 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এর আওতায় পড়ে। কূটনৈতিক দৌত্যের চূড়ান্ত সাফল্যের নজির হিসেবে চীন, জাপান উভয়েই একে অপরের কাছে বাজার হারাবার ভয়ে ভারতে বিনিয়োগ করে উৎপাদন শুরু করার পরিকল্পনা করছে,

স্থিতাবস্থা বজায় না রেখে বহু প্রাচীন অপ্রয়োজনীয় আইনকে তুলে দেওয়া হচ্ছে। কোম্পানি আইনে নতুন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসতে চলেছে। পেট্রল বিনিয়ন্ত্রণ আগে ভাবা হলেও লাগু হয়ে গেছে দ্রুত। এমন নানান ভাবনার রূপায়ণ-পরিকল্পনা সবে ফলিত রূপ নিতে শুরু করেছে। কিন্তু সিলেবাস বিশাল। দেশের তরুণ নির্বাচকমণ্ডলী জাতপাত, ধর্মবিশ্বাস-নিরপেক্ষভাবে বিগত সরকারকে অপসারিত করে মোদীর ঝুলি ভরিয়েছে, নতুন সম্ভাবনাময় সমৃদ্ধ জীবিকার আশায়। বহু রাজ্যে তাদের জাতিগত সমীকরণ তারা ঝেড়ে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, তারা প্রাদেশিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে— জাতীয়তার পথে অগ্রসর হয়েছে। এই পটভূমিতেই শুরুতে বলা ধ্বংসের প্রাসঙ্গিকতা আদৌ শেষ হয়নি, বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ।

স্থিতাবস্থা, মৌরসীপাট্টার বিলোপ না হলে যে আমূল কোনো গুণগত পরিবর্তন হয় না তা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই তো প্রধানমন্ত্রীকে তা করতে হবে। কোনো রঙিন সশস্ত্র বিপ্লব বা কল্পিত অতি বাম রোমান্টিসিজমের অবকাশ এখানে নেই। ঠিক সেই পরিসর ধরেই তিনি রাজ্যগুলিকে 'জায়গির' ভেবে নিয়ে কেন্দ্র থেকে প্ল্যানিং কমিশন মারফত উন্নয়নের ধাঁচা তৈরি করে খরচা বেঁধে দেওয়ার পুরনো কংগ্রেসী ব্যবস্থাটিকে শুরুতেই ভেঙে দিলেন। সংস্থার প্রক্রিয়া ওপর থেকে না চাপিয়ে রাজ্যগুলিই তাদের প্রয়োজনমাফিক পরিকল্পনা নির্মাণ করে কেন্দ্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের অগ্রাধিকার ও ব্যয় নির্ধারণ করবে। যে যোজনা কমিশনের অধিকর্তার শৌচাগার নির্মাণে গরিব দেশের ৩৪ লক্ষ টাকা সরকারি খাতে খরচ হয় সেই ঘুঘুর বাসা তুলে দিলে জাতির মঙ্গল। যোজনা কমিশন বিলুপ্তি নব নির্মাণের পথে অপরিহারযোগ্য ধ্বংসের অন্যতম মাইল ফলক।

অনেক সময়ই বলা হয় আমাদের বিশাল সরকারি উদ্যোগগুলি পরিবর্তন বিমুখ বা সংস্কারের পরিপন্থী। কিন্তু বাস্তবে সেখানে পরিবর্তন পরিমার্জন নিত্য ঘটে চলেছে। অধিকাংশ বাৎসরিক বাজেটেই বহু সরকারি দপ্তর ও সরকার অধিগৃহীত সংস্থা তাদের প্রশাসনিক খরচে বিপুল কাঁটছাট দেখতে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই দপ্তর মানিয়ে নেয়। কাজকর্মের ওপর তার প্রভাব পড়ে না। উদাহরণ হিসেবে কেবলমাত্র টাকায় বাৎসরিক বাঁধা সুদ পাওয়ার মতো বৃদ্ধির ওপর ভরসা করলে যেমন গেরস্থের অবস্থার ইতরবিশেষ হয় না তেমনই অর্থনীতিকে ধাক্কা ছাড়া সরকার কোটি ভারতবাসীর স্বপ্নের দু' অঙ্কের জি ডি পি বৃদ্ধি আশা করতে পারবে না। তাই পরম্পরা বা লিগেসি স্ট্রাকচার-কে ভেঙে একটি পারদর্শী, কর্মক্ষম, ফলদায়ী পাবলিক অ্যাডমিনিসট্রেশন গড়া মোদীর প্রাথমিকতার মধ্যে অবশ্যই আছে। এই কাজে তাঁকে প্রথমেই চিহ্নিত করতে হবে কোন অচলায়তন এখনই ভাঙতে হবে। ভাবলে অবাক হতে হয়। এস আর ও-এর তৈরি মঙ্গলগ্রহমুখী অভিযান (Mars orbitter Mission) যে খরচে আমাদের বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন তা সমগ্র বিশ্বে কেউ পারেনি। গুণীদের সন্ধানও একইসঙ্গে জরুরি। কাজের শুরুতেই বহু অপ্রয়োজনীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রক তুলে দেওয়া (এও সেই ধ্বংস প্রক্রিয়ার অঙ্গ) বা অন্য মন্ত্রকের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। একই মন্ত্রীর হাতে একাধিক দপ্তর রেখে প্রধানমন্ত্রী সেই সূচনাই করেছেন।

আবার সংস্কার সংস্কার বলে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া যে প্রক্রিয়া গত শতাব্দীর ন'য়ের দশক থেকে দেশবাসী দেখে আসছে সেই প্রক্রিয়ার সুফল মাঠে ঘাটে পৌঁছতে হবে। আগের মাথাভারী ব্যবস্থা থেকে সরে এসে জি-২০ সম্মেলনে তিনি সরাসরি বলেছেন যে সংস্কার অবশ্যই গরিবের পক্ষে সুফলদায়ী হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তা শুরু হবে জনতার সমর্থনের ভিত্তিতে। এর থেকে স্থিতাবস্থার বদলে অভ্যন্তরীণ সংস্কার বা Domestic Reform-এর ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা অতীতের প্রচলিত প্রথাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে। দুমদাম করে বিদেশি পুঁজি লগ্নি করে বা অর্থনীতির অভিমুখ সম্পূর্ণ প্রাইভেট সেক্টর বা পুঁজিবাদভিত্তিক করে দিলেই দেশে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে এমনটা নয়। ভারতে আজ বিশাল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ফি বছর দেশব্যাপী কোথাও না কোথাও নির্বাচনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। সেখানে হঠকারী সিদ্ধান্ত জনতার দরবারে তড়িঘড়ি বাতিল শুধু নয় তাঁর সরকারের ওপর অনাস্থা সূচক বলে ধরা হবে। এইখানেই তাঁর মুনশিয়ানা হোক বা ব্যর্থতা সেটি প্রমাণিত হবে। মনে রাখা জরুরি, কাঙ্ক্ষিত সংস্কারের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নের ২০০ শতাংশ সদিচ্ছা থাকলেও তাঁর Denxiaoping বা মার্গারেট থ্যাচার হওয়ার সুযোগ নেই। এঁদের জনগণকে সঙ্গী করে এগোবার বাধ্যবাধকতা ছিল না, ছিল না ঘনঘন নির্বাচনী পরীক্ষা। তাই নিশ্চিন্তে তাঁরা দীর্ঘকালীন সংস্কার প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক ফল দেখিয়েছিলেন। আজকের ভারতে সদা সক্রিয় সম্পূর্ণ স্বাধীন মিডিয়া। কেন্দ্রীয় নীতির ভালো মন্দ বুঝতে না বুঝতেই যে কোনো রাজ্য-নির্বাচনে সংস্কার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে মতামত প্রতিফলিত হয়ে সমগ্র প্রক্রিয়াকেই মাঝপথে থমকে দিতে পারে।

তাই মোদীর পরিকল্পনা অনুযায়ী আমলাতন্ত্রকে জনতার উপযোগী (এক্ষেত্রে অনুদানের রাজনীতি আবার আদৌ চলবে না, তা পরিত্যক্ত) এমন প্রকল্পগুলিই নিতে হবে যার গুণাগুণ জনতা প্রায় জাদুকরী ক্ষিপ্রতায় হাতে পায় বা চোখে দেখতে পারে। তাই মোদীর জনমুখী ও জন-অনুমোদিত প্রকল্পগুলির মার্কেটিং করাও সরকারি দপ্তরগুলির আবশ্যিক কাজের আওতায় পড়বে। এ প্রসঙ্গে বেতারে প্রচারিত তাঁর জনপ্রিয় 'মন কি বাত' কার্যকরি ভূমিকা নিতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাবলম্বী হওয়ার তীব্র সঙ্কল্পে তাঁর মুখাপেক্ষী ৬০ কোটি তরুণ ভারতীয়ের কাছে তাঁর বিশল্যকরণী অবশ্যই উৎপাদন-শিল্প (ম্যানুফেকচারিং)। পুনরুত্থানকামী হীনমন্যতায় আক্রান্ত ভারতবাসীর পক্ষে এই অভ্রান্ত নিদানটি তাঁর থেকে ভালো কেউ জানে না। তাই চীন থেকে জাপান, আমেরিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া, মহাদেশ থেকে মহাদেশে তিনি ধাবমান। দেশে বিনিয়োগ আনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র স্বপ্ন তাঁর সিঙ্গল অ্যাজেন্ডা। কোনো বিরুদ্ধ-বিদ্রূপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারছে না।

চিঠিপত্র

মোদী সরকারের ছ'মাস

ছ'মাস হয়ে গেল মোদী সরকারের। এই সরকারের কার্যপ্রণালীর কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, আচ্ছে দিনের কথা। যদিও এই ছ'মাসে সরকারের কাজের সমালোচনা করাটা ঠিক হবে না বা খুব একটা দোষ দেওয়া যাবে না। প্রথমেই বলতে হয়, কয়েকটি জীবনদায়ী ওষুধের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। এই রোগ গরিব বড়লোক, নীচু-উঁচু চিন্তা করে না। সুতরাং এই ব্যাপারে সরকারের চিন্তাভাবনা করা দরকার। সরকারের এই ব্যাপারে কোনোপ্রকার বক্তব্য কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না।

দ্বিতীয়ত, বিমা বেসরকারিকরণ অর্থাৎ বিমার শেয়ার বিদেশি কোম্পানির উপর বেশিরভাগ ন্যস্ত করা হবে। এতে জনসাধারণ খুবই চিন্তিত। এ বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে এখনও কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না।

তৃতীয়ত, MGNREGA প্রকল্পের কাজ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় (পশ্চাৎপদ) কিছু জেলা বা অঞ্চলেই এই কাজ হবে। এর ফলে জনসাধারণ খুবই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। কেননা এই কাজ নিয়ে গ্রামগঞ্জে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্যই এই নিয়ে অনেক দুর্নীতিও হয়েছে। বহু অবাঞ্ছিত ব্যক্তি সুযোগ নিচ্ছে এই প্রকল্পের, প্রকৃত গরিব মানুষ বঞ্চিত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। মুদ্রাস্ফীতিও কিছুটা বাড়ছে এর ফলে। গ্রামগঞ্জে কৃষিকাজ বা অন্যান্য কাজের মজুর পাওয়া যাচ্ছে না। এই সব কারণে এই কাজ বন্ধ করে দেওয়াটা যুক্তিসঙ্গত হবে না। এই ব্যাপারে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি বা ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না।

স্বচ্ছ ভারত অভিযান বা সাফাই অভিযানে অনেককেই ঢাকঢোল পিটিয়ে ঝাঁটা হাতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে করা সেটা কি হচ্ছে? জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে কি এর ফলে? এই ব্যাপারে সরকারের কী দৃষ্টিভঙ্গি জানা যাচ্ছে না। সরকার কী পদক্ষেপ নিচ্ছে জনসাধারণ দেখতে পাচ্ছে না।

কালো টাকা ফেরানোর ব্যাপারে মোদী বলেছিলেন ১০০ দিনের মধ্যে কালো টাকা বিদেশ থেকে ফিরিয়ে আনবেন। অবশ্য এই ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে। বিরোধীরা এই ব্যাপারে সরকারকে হেয় করার চেষ্টা করছে। এই ব্যাপারে সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করে বহুল প্রচার প্রয়োজন।

পার্টির সদস্য হওয়ার ব্যাপারেও দেখা যাচ্ছে সকলকেই দলের প্রাথমিক সদস্য করে নেওয়া হচ্ছে। ভাল কথা। যাতে করে অন্য দলে লোক না থাকে। কিন্তু এই সমস্ত লোক যারা সি পি এম, তৃণমূল বা কংগ্রেস থেকে আসছে তারা বিজেপিতেও মধুর লোভে আসছে না কে বলতে পারে? এদের শোধন করার কী পদ্ধতি জানা দরকার। এখনই তো লোকে বলতে শুরু করেছে, বিজেপি ক্ষমতায় এলেও এই একই অপকর্ম করবে। দেশের আর কোনো ভাল হবে না। সুতরাং বিজেপি-র এই ব্যাপারে খুব সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন।

জিনিসপত্রের মূল্য স্থিতিশীল রাখাটা একটা বিরাট সাফল্যের ব্যাপারে। অবশ্য এই কয়মাসে সাধারণ জিনিসের দাম যে খুব বেড়েছে তা বলা যাবে না, বরং স্থিতিশীল আছে। সেনসেক্সের মূল্যের ঊর্ধ্বগতি, টাকার মূল্য ডলারের তুলনায় স্থিতিশীল। সোনার মূল্য কমা খুব শুভ লক্ষণ। পেট্রল, ডিজেলের দাম কমা যদিও বিশ্ববাজারের উপর নির্ভরশীল, তবু জনসাধারণের কাছে এগুলি খুবই সুখবর। সাধারণ লোক সরকারকেই বাহবা দিচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতিও নিয়ন্ত্রণে।

অবশ্যই এই কয়মাসের কার্যকলাপের কথা চিন্তা করলে সরকারকে বাহবাই দিতে হবে। তবু সরকারকে বিষয়গুলি সহৃদয়তার সঙ্গে চিন্তা করতে হবে।

—**কমল মুখার্জী**,
চন্দননগর, হুগলী।

বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ড

বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ড পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা ভারতের পক্ষেই এক ভয়ঙ্কর ও নিন্দনীয় ঘটনা। এরাজ্যও যে জঙ্গি কার্যকলাপের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এর আগেও জঙ্গি তৎপরতার ঘটনা এরাজ্যে ঘটলেও পূর্বতন সরকার প্রশাসনিক দক্ষতা দেখাতে পারেনি। কিন্তু কেন্দ্রে জাতীয়তাবাদী সরকার গঠনের পর ইসলামি জঙ্গি সংগঠনগুলোর গোপনে আস্তানা ও জঙ্গিদের ধরা পড়ার ঘটনা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা দেশের পক্ষে এক ইতিবাচক দিক হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। তবে বাংলাদেশের পরোক্ষ মদতে দেশের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে এই ঘৃণ্য ক্রিয়াকলাপ যে ক্রমবর্ধমান তা বলাইবাহুল্য। এ সম্পর্কে ২৭ অক্টোবর স্বস্তিকার প্রতিবেদন অবশ্যই লক্ষণীয় বিষয়। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গ যে ইসলামী সন্ত্রাসীদের বুলেটের নিশানার মধ্যে এসে গেছে তার প্রমাণ অনেক আগেই পাওয়া গেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় চারজন স্বয়ংসেবকের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড, চারজন বাঙালি পুলিশকর্মীর নির্দয় হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে মুসলমান দুষ্কৃতীদের সন্ত্রাসের নমুনা অনেক আগেই প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ এরাজ্যে অনেক আগে থেকেই যে ইসলামি সন্ত্রাসীরা ঘাঁটি গেড়ে বসেছে তা কারও অজানা নয়। তবুও এতদিন দেশের জাতীয়তাবাদ-বিরোধী দলগুলো সেকুলারি আলখাল্লার আড়াল থেকে জঙ্গি দমনে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। আর বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদেরও পরোক্ষে সমর্থন করে গেছে। ফলে জামায়াতে ইসলামির মতো ভারতবিরোধী বাংলাদেশি সংগঠনগুলো ভারতকে ইসলাম রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও মাদ্রাসায় জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবিরেরও প্রমাণ মিলেছে। অথচ রাজ্য সরকার মাদ্রাসাগুলোতে ঢালাও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে

থাকে। তাই এরাজ্যে বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডের মতো আরও ঘটনা ঘটলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। বস্তুত, এরাজ্যই এখন জঙ্গিদের মূল ঘাঁটির কেন্দ্রবিন্দু বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। আর বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডের সঙ্গে কীভাবে আন্তর্জাতিক যোগ, বিদেশি অর্থের যোগান এবং বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের বিষয়টি জড়িয়ে আছে তা এন আই এ-র তদন্তে প্রমাণিত। তবুও বর্তমান রাজ্য সরকার এই বিস্ফোরণ কাণ্ডকে লঘু করে দেখার চেষ্টা করছে। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার নিষ্ক্রিয় থেকেছে। ফলে এরাজ্যে জেহাদি কার্যকলাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেন জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে এই রাজ্য। আর এব্যাপারে কেন্দ্রের জাতীয়তাবাদী সরকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিলেই তার বিরোধিতা করে থাকে রাজ্য সরকার। এরকম চলতে থাকলে এরাজ্যে অরাজকতার মাত্রা ক্রমশই বৃদ্ধি পাবে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশের জনক জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও একই পংক্তিতে রাখার পথ সুগম হবে তা বলা যেতে পারে।

—**সমীর কুমার দাস,**
দ্বারহাট্টা, হুগলী।

হিন্দু জনসংখ্যা কমছে

সংবাদে প্রকাশ, হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছে।

কেন ক্রমশই হিন্দু জনসংখ্যা কমছে? তার কারণ কী? বর্তমানে যুবক-যুবতীরা বিবাহের পর তিন-চার বছর সন্তান গ্রহণ করছে না। অথবা একটি সন্তানের জন্ম দিয়েই জন্মনিয়ন্ত্রণের পথে হাঁটছে। একটি সন্তানের পর দ্বিতীয় সন্তান গ্রহণ করছে না। যার ফলে হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে।

আধুনিক মায়েরা স্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে দ্বিতীয় সন্তান নিতে অস্বীকার করছে। একাধিক সন্তান হলে তাদের মানুষ করা যেমন আধুনিক মায়েদের কাছে কষ্টদায়ক মনে হয় তারপর একটি সন্তানের লেখাপড়ায় বিরাট পরিমাণ অর্থের যোগান। সেই অর্থ দিয়ে একাধিক সন্তানকে মানুষ করা মোটেই কষ্টদায়ক হবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নজরুল ইসলাম, নেতাজী সুভাষ এই সব প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষদের মায়েরা একাধিক সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। অপরদিকে আধুনিকা মায়েরা ওই প্রাতঃস্মরণীয়দের মতো কয়জন সন্তান সমাজকে উপহার দিতে সক্ষম হয়েছেন? মুসলমান সমাজ জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী নয়। জন্মনিয়ন্ত্রণ তাদের কাছে ইসলাম বিরোধী। যার ফলে সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু তক্‌মায় আটকে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক স্বার্থে। মুসলমান সমাজ সংখ্যালঘু তকমা নিয়েই থাকতে চায়। কারণ সংখ্যালঘু হিসাবে নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে। বাস্তবে মুসলিম সম্প্রদায় সংখ্যালঘু নয়। জনগণনার সময় পরিবারের সদস্য সংখ্যা কম করে দেখিয়ে সংখ্যালঘু তকমা বজায় রাখাই মূল উদ্দেশ্য।

—**অনিলচন্দ্র দেবশর্মা,**
দেবীবাড়ি, নতুন পাড়া, কোচবিহার।

সরকারি ফাইল ও কিছু অজানা তথ্য

কয়েকটি অজনা তথ্য সম্প্রতি জানতে পারলাম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে সব মন্ত্রণালয়ে এখন পুরনো ফাইল খোঁজা অভিযান চালানো হচ্ছে। নর্থ ব্লকের কিছু স্টিলের আলমারি থেকে এরকম কিছু ফাইল বেরিয়ে এসেছে। এর মধ্যে একটি ফাইল থেকে জানা গেল যে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সরকার স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটনকে ইংল্যান্ডে ফিরে যাবার জন্য ৬৪ হাজার টাকা ভাড়া এবং খাওয়া খরচের জন্য দিয়েছিলেন। একজন সরকারি আমলার মতে, এই টাকার মূল্য আজকের দিনে কয়েক কোটি টাকার সমান।

আরেকটি অবাক করা সংবাদ হল, আমাদের দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ নিজের পেনসন নিতে অস্বীকার করেন এবং তাঁর পেনসন রাষ্ট্রীয় আপদা কোষে পৌঁছে যেত এবং দেশসেবায় ব্যয় করা হতো। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীও বেতন না নিয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর বেতনও রাষ্ট্রীয় আপদা কোষে জমা হতো এবং দেশসেবার কাজে ব্যয় হতো।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর দু'টি ছবি পাওয়া গেছে। ছবি দু'টিতে তাঁর দু'রকম ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটেছে। একটি প্রকৃতির সঙ্গে অনায়াস আমাদের প্রিয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, আরেকটি বিমানযাত্রাকালীন সরকারি ফাইল পাঠরত একজন নিষ্ঠাবান, সরকারি কর্মচারী। অথচ এই কাজের জন্য তিনি বেতন গ্রহণ না করে নিঃশব্দে তা দেশের প্রয়োজনে সমর্পণ করেছেন। তাঁর স্ত্রী সহজ সরল অতি সাধারণ শাড়ি পরিহিতা একজন মনোযোগী পাঠিকা। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সার্থক প্রতিফলন আমরা স্বামী-স্ত্রীর এই চিত্রটিতে দেখতে পাই। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার এক মাসের মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ ধুলোভরা ফাইল নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হস্তক্ষেপে তথা নির্দেশে বাকি ফাইলগুলি নষ্ট না করে পরিষ্কার করা হচ্ছে। ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ ফাইলগুলিকে পাঠানো হবে জাতীয় সংগ্রহশালায়।

—**সুতপা ভড়,**
পালামপুর, হিমাচল প্রদেশ।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপি মূল্য ১০.০০ টাকা

বাষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০্ টাকা

সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবনা

মীরাদেবী বালা

বিশ্ব প্রকৃতি একটা নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। প্রকৃতির রাজ্যে একটা নিয়ম হলো— উৎপত্তিস্থলে সকলকেই ফিরে যেতে হবে। যে সূক্ষ্ম প্রাণবীজ হতে এই পূর্ণ মানবের সৃষ্টি হয়েছে, ক্রমসংকোচিত হয়ে সেই বীজেতেই অবশেষে তাঁকে ফিরে যেতে হবে। তিনটি মাত্র মূল তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয়। এই তিনটি তত্ত্ব হলো— সত্ত্ব, রজঃ ও তম। সত্ত্ব হলো সমাধি, রজঃ হল বন্ধন ও তম হলো সংহার। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুই এই তিন তত্ত্বের যোগ বিয়োগ দ্বারা সংঘটিত হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই হলো প্রকৃতি। সাংখ্য মতে— নির্গুণ চৈতন্যময় পুরুষের বিপরীত ত্রিগুণাত্মক আধান বা শক্তি হলো প্রকৃতি। তাই প্রকৃতিকে আদ্যাশক্তি বা সৃষ্টির মূল বা আদি কারণ বলা হয়। এখানে পুরুষ হলো ঈশ্বর বা আত্মা বা চৈতন্য। পুরুষ সান্নিধ্য দ্বারা প্রকৃতির ভিতরে চৈতন্যের আধান হয়। আবার খেলা শেষে পুরুষেই সমস্ত কিছু লীন হয়।

সমস্ত সৃষ্টির মূলে আছে দুটি আধান। জীব ও জড়। জীব হলো বিষয়ী এবং জড় হলো বিষয়। অন্যভাবে বলা যায়, জীব হলো জ্ঞাতা এবং জড় হলো জ্ঞেয়। বিষয়ী বা জ্ঞাতা বিষয় বা জ্ঞেয়কে মন্থন করে যা উপলব্ধি করে সেটা হলো জ্ঞান। জ্ঞান হলো পরম সত্তা। আবার বিষয় যদি না থাকে তাহলে বিষয়ীর উপলব্ধিরও কিছু থাকছে না। সুতরাং বিষয় ও বিষয়ী অর্থাৎ জড় ও জীব হলো একই পরম সত্তার দুটি অবস্থা। এই পরম সত্তাকে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলেছেন 'ঈশ্বর'। মার্কিন দার্শনিক এমার্সন বলেছেন 'পরমাত্মা' এবং বেদান্ত বলছে 'ব্রহ্ম' বা ব্যাপক 'চৈতন্য'। এই চেতন সত্তা বা চৈতন্যকে অনুভূতিতে আনাই হলো জ্ঞান। সৃষ্টির প্রারম্ভে সমস্ত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় এই এক ব্রহ্মসত্তা হতেই উদ্ভূত হয় এবং প্রলয়কালে তারা সবাই সেই ব্রহ্মেই বিলীন হয়ে যায়।

'ব্রহ্ম' এক ও অনন্ত। কোনো সীমা দ্বারা তাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। 'ব্রহ্ম' হলো সম্পূর্ণ উপলব্ধির বিষয়। এই 'ব্রহ্ম' হতেই জগৎ সৃষ্টি— আবার ব্রহ্মেই জগতের লয়। আমরা স্বাভাবিকভাবেই দেখতে পাই সমুদ্রের জলে অসংখ্য ঢেউ ওঠে— কিন্তু পরক্ষণেই সেই ঢেউ আবার সমুদ্র জলে বিলীন হয়ে যায়। বার বার এরকম দেখে দেখে আমরা অনুভব করতে পারি যে সমুদ্র এবং তার জলরাশি আলাদা কিছু নয়। অর্থাৎ জল ও ঢেউ একই সমুদ্রের দুটি সত্তা মাত্র। জল বাষ্প হয়ে যেমন মেঘের সৃষ্টি--- তেমনি মেঘের পরিণতি হলো জল। একটা থেকে অন্যটাকে কোনো ভাবেই আলাদা করা যায় না। আর এই সব কিছুর পেছনে আছে এক মূল সত্তা। যাকে বলা হয় 'ব্রহ্ম'। এই 'ব্রহ্ম'ই সবকিছুর উৎস। সূর্য যেমন সমস্ত পৃথিবীতে সমভাবে আলো ও তাপ বিকিরণ করছে— তেমনি ব্রহ্ম তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে বিরাজ করছে। সূর্যের আলো ও তাপকে যেমন সবাই সমভাবে নিতে পারে না— তেমনি ব্রহ্মকে সবাই উপলব্ধি করতে পারে না। ব্রহ্মহীন হয়ে এজগৎ চলতে পারে না। ব্রহ্মের একটা শক্তি হলো 'মায়া'। এই মায়া শক্তির সাহায্যেই ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই মায়ারই দুটি অংশ— পুরুষ ও প্রকৃতি, জীব ও জড়। এই মায়া শক্তিকে সঠিক ভাবে মন্থন করে যিনি আত্মচেতনা বা আত্মোপলব্ধি লাভ করতে পারবেন তিনিই আত্মবান বা 'শিব'— যার কোনো বিকার থাকবে না। প্রকৃতির উপর ঊর্ধ্বমুখী পুরুষ। সভ্যতা শুরু সময় থেকেই ভারত এর পূজা করে আসছে।

আত্মচেতনা বা আত্মোপলব্ধি আসবে কেমন করে— তা উপলব্ধি করতে গিয়েই ধর্ম বা ধম্ম কথাটা উঠে এল। এখানে 'ধ' হলো ধরে রাখা এবং 'ম্ম' হলো নিজেকে বা আত্মাকে। আত্মা বা নিজেকে চেতনায় ধরে রাখাই হলো ধর্ম বা ধম্ম। নিজেকে চেতনায় ধরে রাখতে গেলে প্রথমেই যার সাহায্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন সে হলো 'মন'। মনের চিরচঞ্চল বিচিত্রমুখী গতি আমাদের আত্মজ্ঞান লাভের পথে প্রধান অন্তরায়। মায়ার অপর একটি নাম 'মন'। এই মনের দুটি শক্তি। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি হলো পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্য ও সম্পদকে কামনা, বাসনা দ্বারা ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা। এবং নিবৃত্তি হলো মনকে পৃথিবীর মায়াসৃষ্ট নশ্বর ভোগ বাসনা থেকে গুটিয়ে এনে স্বীয় আত্মায় নিয়োগ করা। মনকে সংযত করার নিরন্তর চেষ্টার নামই হলো 'সাধনা'। মন যখন চৈতন্য স্পর্শে আলো পাবে তখনই আত্মা

জাগ্রত হবে। আত্মা জাগ্রত হলে মনের সব কলুষতা দূর হবে। এজন্যই মনকে রূপ, রস, গন্ধে পরিপূর্ণ প্রপঞ্চময় বহির্জগত থেকে গুটিয়ে এনে সচ্চিদানন্দে ডুবিয়ে রাখতে হবে। উপনিষদ বলছে— ‘একমাত্র সেই আত্মাকে উপলব্ধি কর, অন্য সব বৃথা অসার বাক্য পরিত্যাগ কর’।

প্রকৃত সত্যকে জানা বা অনুভূতিতে আনাই হলো জ্ঞান। বুঝবার ক্ষমতা বা শক্তিকে জ্ঞান বলে। এই জ্ঞান আলোক বর্তিকাস্বরূপ। যে আলো মনের সমস্ত তমসা বা অন্ধকারের অবসান ঘটাতে পারে। এই তমসা বা অন্ধকার নাশ করার জন্যই বোধ হয় কৃষ্ণ নামের উৎপত্তি। কৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি কর্ষণ করে আগাছারূপ সমস্ত মোহ অন্ধকার পরিস্কার করে অন্তরকে কলুষতা মুক্ত করেন। সমস্ত সংশয় ছেদন করে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করতে কৃষ্ণই অর্জুনকে উপদেশ করেছিলেন। জ্ঞান হলো জ্যোতি বা প্রভাবস্বরূপ— যা সুপ্ত রাজ্যের দ্বার খুলে দেয়। জীব নিজেই নিজেকে অমৃতের সন্তান বলে অনুভব করতে পারে। এতদিন অজ্ঞানতার আবরণে দেহশক্তি ও ইন্দ্রিয় পরবশতার জন্যই সে নিজেকে পাঞ্চভৌতিক নশ্বরদেহ মাত্র বলে মনে করতো। কিন্তু সে স্বরূপত সচ্চিদানন্দ, শাশ্বত অব্যয় আত্মা— এটা জ্ঞানের মাধ্যমেই সে প্রথম অনুভব করে, তাই বলা হয় জ্ঞানই জীবের সমস্ত বাহ্যিক অহঙ্কার পুড়িয়ে তাঁকে খাঁটি সোনায় পরিণত করে। তখন তাঁর মধ্যে একটাই অনুভূতি থাকে— যাকে ‘পূর্ণ’ বলা হয়। এই পূর্ণই অনন্ত ও সর্বব্যাপী ‘ব্রহ্ম’।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো মানুষ। যার মান এবং হুঁশ আছে— সেই মানুষ। কারণ মানবদেহেই সৃষ্টির সব কলাকৌশলের পূর্ণাবস্থা লক্ষ্য করা যায়। তাই একমাত্র মানুষের পক্ষেই সম্ভব আত্মস্বরূপ উপলব্ধির দ্বারা সমগ্র জগতের জ্ঞান লাভ করা। কোনো বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে তার প্রতিটা তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারাই হলো প্রকৃত জ্ঞান বা জানা। মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো আত্মজ্ঞান লাভ করা— যার দ্বারা এই বিশ্বকে সর্বতোভাবে বুঝতে পারা যাবে। তাই সৃষ্টির প্রধান সত্তা হিসাবে আমাদের প্রধান কর্তব্য হলো মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সূক্ষ্ম চৈতন্য হিসাবে এই মনুষ্যত্ব বিরাজ করে। তাকে ঘষেমেজে উজ্জ্বল করতে পারলেই নির্মল বুদ্ধি জাগ্রত হয়। আর নির্মল বুদ্ধিই প্রকৃত বিচার বিশ্লেষণের শক্তি জাগায়। আমরা বিষয় থেকে বিষয়ীকে পৃথক ভাবে বুঝতে পারি। আয়নায় যেমন ধুলো পড়লে সঠিকভাবে নিজের প্রতিবিম্ব দেখা যায় না— ধুলো পরিষ্কার কাপড়ে মুছে ফেলতে হয়, তেমনি দীর্ঘদিন অব্যবহারের ফলে আমাদের মনুষ্যত্বের উপরও একটা আস্তরণ পড়ে যায়। নিত্য পরিচর্যার দ্বারা তাকে ঝকঝকে করে তুলতে হয়। নিত্য ধ্যানের মাধ্যমে চিত্ত হতে ধীরে ধীরে বিষয় অপসারিত হতে থাকে ও আত্মপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এভাবে চলতে থাকলে এমন একটা পর্যায় এসে উপস্থিত হয় যেখানে কোনো ভেদ থাকে না। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এক হয়ে যায়। মানুষ অমরত্ব লাভ করে। তখন জন্ম মৃত্যু বলে কিছু থাকে না। মানুষই স্বয়ং ব্রহ্মে পরিণত হয়। ■

লাক্সারী ট্যুরিষ্ট লঞ্চে সুন্দরবন ভ্রমণ করুন

সুন্দরবন ভ্রমণের নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

বনভূমি ট্রাভেলস্

প্রো : মৃগাঙ্ক রায় (বাপী)

মোবাইল : 9734206040 / 9800684201

অফিস : ক্যানিং রেলওয়ে মার্কেট

ক্যানিং টাউন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

গ্রুপ ট্যুরের ব্যবস্থা আছে

ইমেল : banbhoomitravels@gmail.com

স্বাধীনতা সংগ্রামী ধর্মপ্রাণ বীর শহীদ জিতুবাবা

তরুণ কুমার পণ্ডিত

ভারত তখন পরাধীন। ইংরেজ শাসনকালে মালদা জেলার হবিবপুর থানার খোঁচাকন্দর (পর্বতপাড়া) গ্রামে জিতু সাঁওতাল (প্রকৃত নাম জিতু হেমব্রম) জন্মগ্রহণ করেন। খুব বেশি লেখাপড়া না জানলেও নিরক্ষর ছিলেন না। তিনি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রবর্তিত আর্য সমাজের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাঁওতাল সমাজের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কারের প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন। সহজ সরল বনবাসী সমাজ তাই ভালোবেসে তাঁকে জিতুবাবা নামে সম্বোধন করতো। জিতুবাবা মালদা জেলার তৎকালীন স্বনামধন্য আর্যসমাজী সমাজ সংস্কারক এবং প্রথিতযশা উকিল কালীকিঙ্কর চক্রবর্তীর সান্নিধ্যে আসেন এবং প্রেরণা লাভ করেন। তাঁর চেষ্টায় 'সত্যম শিবম সুন্দরম্' নামে একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়ে ওঠে। জিতুবাবার পরাক্রমী ও বলিষ্ঠ সাংগঠনিক উদ্যোগে মালদহের বরেন্দ্র অঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী জেলা দিনাজপুরের বিভিন্ন গ্রামে সত্যম শিবম সুন্দরম্-এর অগণিত শাখা ও অনুগামী তৈরি হয়। সাঁওতাল সমাজকে সংগঠিত করে ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কার প্রদানের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাঁকে সাঁওতাল সমাজ 'সর্দার' (যোদ্ধা) উপাধি দেয় এবং জিতু সর্দার হিসাবে খ্যাত হন। সেই সময় আদিনার আদিনাথ মন্দিরে জিতু সর্দারের নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়। আদিনা মসজিদে দু'জন ধর্মান্তরিত সাঁওতালকে দেখে জিতু সর্দারের অন্তর বেদনায় কাতর হয়ে ওঠে। হাজার হাজার সাঁওতাল নারী-পুরুষ আদিনা এলাকাকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে এবং ইংরেজকে 'কর' দিতে অস্বীকার করে। এই সময় জে এন তালুকদার মালদার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি তদানীন্তন পুলিশ সুপার ও বশংবদ কয়েকজন জমিদার এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী-সহ আদিনা যান এবং জিতু সর্দারকে আলোচনার জন্য ডেকে পাঠান। জিতু সর্দার বলে পাঠান যে, তিনি সরকারি লোকদের বিশ্বাস করেন না। তবে তাঁদের এলাকার জমিদার আশুতোষ চৌধুরী যদি তাঁকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেন তবেই তিনি আসতে পারেন। আশুবাবু জেলা শাসকের আশ্বাসে বিশ্বাস করে জিতু সর্দারকে আলোচনার জন্য আসতে বলেন। কিন্তু এই আলোচনায় কোনো মীমাংসা না হওয়ায় জিতু সর্দার যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন ইংরেজের খয়ের খাঁ জনৈক জমিদার খানচৌধুরী তাঁকে পিছন থেকে গুলি করে হত্যা করে। সঙ্গে সঙ্গে লড়াই শুরু হয়ে যায়। বহু সাঁওতাল যুবক তির ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করে হতাহত হয়। কয়েকটি গরুর গাড়ি ভর্তি তির ধনুক মালদা কাছারিতে নিয়ে আসা হয়। জিতুবাবার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্জুনের ডান হাতে গুলি লেগে গ্যাংগ্রিন হওয়ায় তাঁর ডান হাতটি সম্পূর্ণ কেটে বাদ দিতে হয়। জিতু সর্দার শহীদ হন ১৯৩২ সালের ১৪ ডিসেম্বর। তাঁর ভাই পরবর্তীকালে হিন্দু মহাসভার সদস্য হন।

১৯৭৮ সাল থেকে মালদা জেলার হবিবপুর থানার খোঁচাবন্দর গ্রামে জিতুবাবার স্মৃতিতে সাঁওতাল সমাজের ধর্মগুরু সমাজসেবী শিবু মুর্মু ও তাঁর ধর্মপত্নী রেখা হেমব্রম-এর উদ্যোগে 'বাবা জিতু' মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। মালদা ও দিনাজপুর জেলার সাঁওতাল সমাজ আজও পরম শ্রদ্ধায় জিতুবাবাকে স্মরণ করে।

(১৪ ডিসেম্বর ৭৯তম বলিদান দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

চিরদিনের লেখা

নবাঙ্কুর

জয় চিরজীবী মানুষের

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

তোমার প্রথম লেখা সম্পদকেরা ফেরত দিয়েছেন। সম্পাদকেরা তোমাকে বিশেষ অনুগ্রহ দেখিয়েছেন। এই একটি ব্যাপারে তুমি আজ সহসা জগতে এক শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকদের দলে ভিড়ে গিয়েছ। তুমি জান, আজ যারা মহাযশস্বী, কাল তাঁরা

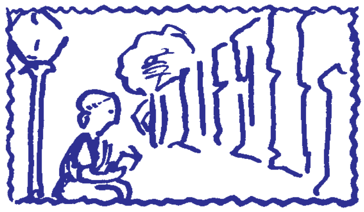

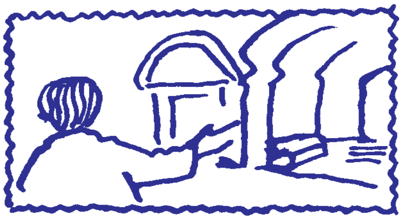

ছিলেন মহা প্রত্যাখ্যাত। জগতে যেখানে ইংরেজি বর্ণমালা গিয়ে পৌঁছিয়েছে সেখানেই তিনটি বিশেষ ইংরেজি অক্ষর পাশাপাশি দেখলেই লোকে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। জি বি এস (G.B.S.)। এত সু-পরিচিত নাম ইংরেজি-জানা মহান আজ আর একটি নেই। তাঁর সঙ্গে এক মিনিট কথা বলতে পারলে, জগতের যে কোনো প্রধানমন্ত্রী নিজেকে ধন্য মনে করতেন। অথচ একদিন লন্ডনের রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে তিনি দিনের পর দিন কথা বলেছেন। কেউ শোনেনি। আজ তাঁর একটা ছোট প্রবন্ধের যা দাম, জগতের সবচেয়ে ধনী দেশের প্রধানমন্ত্রীর একমাসের তা মাইনে। অথচ তাঁর যৌবনে লন্ডনের কোনো সংবাদপত্রের সম্পাদক তাঁর লেখা ছাপায়নি। লন্ডনের প্রত্যেক পুস্তক প্রকাশক তাঁর পাণ্ডুলিপি ফেরত দিয়েছেন। বারবার তিনি পাঠিয়েছেন, বারবার তাঁরা ফেরত দিয়েছেন। তাঁর পুরো নাম হয়তো জানো— জর্জ বার্নাড শ।

রম্যাঁ রোঁলার নাম নিশ্চয়ই শুনেছো। গান্ধীজী আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুত্বে ধন্য। তাঁর অমর কীর্তি হলো বিরাট নভেল 'জাঁ ক্রিসতোফ'— বিংশ শতাব্দীর মহাভারত। জগতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের একখানি। অথচ দেখো, যেদিন প্যারী শহরে প্রথম এই বই প্রকাশিত হয়, তখন কেউ ফিরেও দেখেনি। দশ বছর কেউ এই বই ছোঁয়নি।

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার উইলিয়াম শেকস্পীয়ার, তাঁর সময়ের নাট্য জগতে প্রথমে কোথায় স্থান পেয়েছিলেন জানো হয়তো। তখন শহরের বাইরে হতো থিয়েটার। তাই থিয়েটার দেখতে যে সব বড়লোক যেতেন, তাঁরা অনেকে ঘোড়ায় চলে যেতেন। এই থিয়েটারে তাঁদের ঘোড়া রাখার জন্য আস্তাবল থাকতো। শেকস্পীয়ার সেই আস্তাবলে ঘোড়া রাখবার ভৃত্যের স্থান পেয়েছিলেন। আর আজ একবার হিসাব করে দেখ, শেকস্পীয়ার সম্বন্ধে জগতে প্রায় ৫০ হাজার বই লেখা হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের কাগজে তাঁর সম্বন্ধে প্রায় তিরিশ লক্ষ প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে।

মানুষের মধ্যে আছে এক অপূর্ব রসায়ন, যার সাহায্যে সে যে কোনো বাধার উপরে উঠতে পারে। যতক্ষণ তার মন সজাগ থাকে ততক্ষণ বাইরের কোনো বাধাই তাকে অবশ করতে পারে না। চিরজয়ী মানুষের মন।

ইংল্যান্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মিলটন অন্ধ হয়ে গেলেন। সম্পূর্ণ অন্ধ। সেই অন্ধ অবস্থায় লিখলেন ইংরেজি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট'।

এবার এসো আমাদের দেশে। চিনতে পারছো না! পুরনো কলকাতা... মাঠ, পুকুর, জঙ্গল আর কিছু বড় বাড়ি। ওই যে দেখছো ছেলেটি... লঙ্কা আর হলুদ বেটে হাত জ্বালা করছে, সন্ধেবেলায় তার ঘরেও পিদিম জ্বলে না। এই দেখ, রাস্তার ধারে গ্যাসের তলায় দাঁড়িয়ে পড়ছে। প্রণাম কর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

পথ যে চলতে চায়, মরুভূমির ভেতর থেকে সে পথ বের করে নেয়। লক্ষ্য তার স্থির, পৌঁছোবেই যে করেছে পণ, হিমালয় তাকে মাথা নত করে পথ ছেড়ে দেয়, মহাসাগর তরঙ্গ সরিয়ে নিয়ে তাকে পথ দেখিয়ে দেয়, মৃত্যু নিজে এসে তার কপালে পরিয়ে দেয় জয়-তিলক।

জয় হোক জীবনের। জয় হোক চিরজয়ী মানুষের মনের।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত।

রঙ ভরো

প্রশ্নবাণ

১. ভারতের সংবিধানে ক'টি ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে?

২. গ্রামীণ দারিদ্র্যের প্রধান কারণ?

৩. চাকরিজীবী কাকে বলা হয়?

৪. নগরজীবনে দারিদ্র্য কেন?

৫. প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা কবে থেকে শুরু?

উত্তর : ১. বাইশটি ২. দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মূলধনের অভাব, কৃষি ছাড়া অন্য কাজ না থাকা, নিরক্ষরতা, দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি ঠিকমতো রূপ না নেওয়া। ৩. যে বছরে ২৭৩ দিন আট ঘন্টা কাজা করে। ৪. গ্রাম থেকে শহর আসা, দক্ষ কর্মীর অভাব, বাসস্থানের সমস্যা, সীমিত কর্মসংস্থান। ৫. ২০০০ সাল।

ফিরে পড়া

আদর্শ ছাত্র

কুসুমকুমারী দাশ

(১৮৭৫-১৯৪৮)

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে?
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।
মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন,
'মানুষ' হইতে হবে— এই তার পণ।

বিপদ আসিলে কাছে, হও আগুয়ান,
নাহি কি শরীরে তব রক্ত, মাংস, প্রাণ?
হাত-পা সবারই আছে, মিছে কেন ভয়,
চেতনা রয়েছে যার, সে কি পড়ে রয়?

সে ছেলে কে চায় বল? কথায় কথায়
আসে যার চোখে জল, মাথা ঘুরে যায়।
সাদা প্রাণে হাসি মুখে কর এই পণ
'মানুষ' হইতে হবে মানুষ যখন।

কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার
সবার রয়েছে কাজ এ বিশ্বমাঝার।
হাতে প্রাণে খাট সবে, শক্তি কর দান
তোমরা মানুষ হলে দেশের কল্যাণ।

‘অবলা কেন মা এত বলে’

সালমা খাতুন

‘নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা।’—

নারীর এই আর্ত চিৎকারের দিন শেষ। নারীর এখন সর্বত্র অবাধ বিচরণ। কারও দয়ার ওপর নির্ভর করে নয়, নিজ যোগ্যতাবলেই তাঁরা তা প্রমাণ করছেন। ভারতের এয়ার চিফ মার্শাল অরূপ রাহা নারীর এই কর্মক্ষমতা উপলব্ধি করেই ঘোষণা করেছেন, বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান চালানোর জন্য খুব তাড়াতাড়ি মহিলা পাইলট নিয়োগ করা হবে। এমনিতে সেনাবাহিনীর তিন বিভাগ— জল, স্থল ও বায়ুসেনাতে মহিলারা অফিসার হিসাবে কাজ করছেনই, তা সত্ত্বেও সেনাবাহিনীতে অফিসারের সংখ্যা কম থাকায় দক্ষতা অনুযায়ী মহিলাদের বায়ুসেনা-সহ সমস্ত বিভাগে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ট্রেন চালকের আসনে মুমতাজ কাজী (বাঁদিকে), মুম্বাইয়ে মহিলা পুলিশ— ঈগল ব্রিগেড।

যে দেশে মেয়েদের উচ্চস্বরে গান গাওয়া বারণ, সেই পাকিস্তান গত বছর ফাইটার বিমানের পাইলট হিসেবে একজন মহিলাকে নিযুক্ত করেছে। পাক পাঞ্জাবের বহাবলপুরের বাসিন্দা ২৬ বছর বয়সী আয়েশা ফারুক সে দেশের যুদ্ধবিমানের প্রথম পাইলট। আয়েশা পাকিস্তানের ১৯ জন মহিলা বায়ুসেনার মধ্যে একজন। এছাড়া আরও পাঁচ মহিলাকে পাকিস্তান যুদ্ধবিমানের পাইলট হিসেবে চয়ন করেছে।

ভারতে প্যারামিলিটারি বাহিনীতে মহিলারা আগে থেকেই লড়াকু ভূমিকায় আছেন। বি এস এফ-এ প্রথম ২০০৯ সালে সিপাই পদে মেয়েদের প্রবেশাধিকার দিয়েছে। ২০১৪ সালে অ্যাসিস্টেন্ট কমান্ডার পদে মহিলা অফিসার নিয়োগ করেছে। আই টি বি এম-এ ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে লড়াকু ভূমিকায় নেওয়া হয়েছে। সি আর পি এফ-এ ২০১৩ সালে ৩৫ জনের মহিলা গ্রুপ নকশালদের সঙ্গে লড়ার জন্য কম্বাট ভূমিকায় নেওয়া হয়েছে।

এস এস বি অর্থাৎ সশস্ত্র সীমা বল ২০১৪ সালে মেয়েদের কম্বাট অফিসার পদে সরকার নিয়োগ করেছে। পুলিশ বিভাগে সাধারণ পুলিশকর্মী থেকে শুরু করে আই পি এস পদে মহিলারা অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন।

সারা দেশে মহিলাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার বাড়ছে। এবছর মুম্বইয়ে ৩৩৮টি বলাৎকারের মামলা দায়ের হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এবার ১০০টি মামলা কম। মুম্বই পুলিশের দাবি, এটা তাদের সক্রিয়তার জন্য হয়েছে। ইতিমধ্যে মুম্বই পুলিশ মহিলা ঈগল ব্রিগেড ও মহিলা মার্শাল নিয়োগ করেছে। আধুনিক ট্রেনিং ও উপকরণ-সহ এই মহিলা ব্রিগেড ও মার্শাল মুম্বইয়ের রাস্তায় রাস্তায় দেখা যাচ্ছে। বেয়াদব যুবকদের তারা লাথি ঘুঁষিতে জেরবার করে দিচ্ছেন। মুম্বই পুলিশ কমিশনার রাকেশ মারিয়া জানালেন, ২০০ মহিলা পুলিশকে এই ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। মহিলা মার্শালরা সাধারণ বেশে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখেন। ঈগল ব্রিগেড রাত্রি ৯টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত এলাকায় নজরদারি চালায়। এই কাজে তাঁরা ইতিমধ্যেই দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন।

এদিকে এশিয়ার প্রথম মহিলা ডিজেল ইঞ্জিন (ট্রেন) ড্রাইভার হিসাবে মুম্বইয়ের মুমতাজ কাজীর নাম লিমকা বুক অফ রেকর্ডস-এ স্থান পেয়েছে। মুমতাজ বেশ কয়েক বছর ধরে মুম্বইয়ের ‘লাইফ লাইন’ ট্রেন চালাচ্ছেন। দুই সন্তানের মা মুমতাজ আজ থেকে ২৫ বছর আগে ট্রেন ড্রাইভার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যখন এই লাইনে আসার কথা কোনো মহিলা ভাবতেই পারতেন না।

সুতরাং মহিলারা এখন আর মোটেই অবলা নন, তাঁরা অনেক সবলা। ■

গীতার বিশ্বতত্ত্ব

ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের বহু শতাব্দী আগেই গীতা এবং অর্থশাস্ত্র ভারতকে কূটনৈতিক পারদর্শিতার শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল

অতিথি কলম

হেনরি কিসিংগার

প্রাচীন ভারতে প্রচলিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চলাচল, অস্তিত্ব সবই হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বের সংজ্ঞা অনুযায়ী এক অপরিবর্তনীয় চিরন্তন সূত্রে আবদ্ধ। এই জ্ঞান ভাণ্ডার লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ছিল শ্রুতিতে স্মৃতিতে বহমান। রাজার পতন হবে, রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে, সৃষ্টি হবে নতুন রাজত্বের। আবহমানতার এই অবিচ্ছিন্নতায় শুধু সেই সমস্ত মনীষীরাই আস্থাবান ছিলেন যাঁরা দিব্যচক্ষে উপলব্ধি করতেন যে কোনো জাগতিক উত্থান বা রাজ-রাজত্বের অনিত্যতা। তাঁরা তন্ময় হয়ে সাধনা করতেন ধ্যানগোচর চিরন্তন চিন্ময়তার।

ভারতের ধ্রুপদী গ্রন্থ 'ভগবদ্গীতা' এই তাৎক্ষণিক ও চিরন্তনের আধ্যাত্মিক দোলাচলকেই ক্ষমতা ও নৈতিক আদর্শ সংঘাতের পটভূমিতে বিধৃত করেছে। মনে পড়বে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয় হননের আশু সম্ভাবনায় বিমূঢ় অর্জুন পরিণতির ভয়াবহতায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ভাবছেন কি যুক্তিতে মান্যতা দেওয়া যাবে এই জ্ঞাতি যুদ্ধের আসন্ন মৃত্যু মিছিলকে। ঠিক এই মুহূর্তেই বার্তা দিলেন প্রাজ্ঞ সারথি শ্রীকৃষ্ণ। মুহ্যমান অর্জুনকে তিনি বললেন, এ রাজত্ব অনিত্য কিন্তু জীবন চিরন্তন, অক্ষয়। আত্মা অমর শুধু নয়, চক্রাকারে হয় তার দেহধারণ। এই জগতের অন্তর্নিহিত আবর্তন কেউই বিনষ্ট করতে পারে না। অর্জুনকে তিনি বললেন, তোমার নির্দিষ্ট কর্ম সঠিক ভাবে সম্পাদন করাই একমাত্র কর্তব্য, তাতেই আসবে মোক্ষ। অবশ্যই তোমার সেই কাজ হয়ত বাইরে থেকে মনে হবে বিভ্রান্তিকর বা পরিহাসযোগ্য। কিন্তু আসলে সে কাজ তো শুধুমাত্র নিত্যকে আয়ত্ত করার জন্যই করা। পরিবর্তনশীল বস্তুর বাস্তবতা বা চিরন্তন অস্তিত্ব থাকে না। চিরন্তনই কেবল আরাধ্য, কেননা তা অব্যয় অক্ষয়।

সকলেই জানেন অর্জুন এমন একটা সম্মুখ সমরে দাঁড়িয়ে ছিলেন যা তাঁর ইচ্ছাবিরুদ্ধ। কিন্তু সেই অস্বস্তিদায়ক পরিস্থিতিকে আয়ত্তাধীন করে স্থিরচিত্ত থেকে নিজের সম্মান অটুট রাখার দায়ও তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাই যুদ্ধ তাঁকে করতেই হবে, তাঁরই হাতে ঘনিয়ে আসবে বহু নিকট জনের মৃত্যু। তবু স্থিতধী থাকা ছাড়া তাঁর পথ নেই। দুঃখ করার তো নয়ই।

শ্রীকৃষ্ণের এই সনির্বন্ধ আবেদন নাড়া দিয়েছিল অর্জুনকে। কর্তব্যের আহ্বান তিনি এড়াতে পারেননি। এই হিন্দু মহাকাব্যে এর পর বিষদে বিধৃত হয়েছে যুদ্ধ পরিস্থিতিগুলি এবং তার করুণ পরিণতি যা কিন্তু অর্জুনের প্রারম্ভিক অনিচ্ছারই প্রতিধ্বনি। হিন্দু জাতির এই প্রতিনিধিত্বমূলক মহাকাব্য শিক্ষা দিয়েছে যে নীতি আদর্শ বিসর্জন না দিয়েও অপরিহার্য ক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা যেখানে অমোঘ সেখানে যুদ্ধই শ্রেয়। কিন্তু একই সঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে মৃত্যু নয়, আত্মার অমরত্বের তত্ত্ব। বিশ্বের বহু নেতাই এই যুদ্ধপর্বকে নির্ভরতার প্রতি এক অসাধারণ আহ্বান বলে তুলে ধরলেও মহাত্মা গান্ধী গ্রন্থটিকে এক 'আধ্যাত্মিক অভিধান' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এখন পর্যবেক্ষণের বিষয় হচ্ছে যে ধর্মে বারবার যে কোনো পার্থিব প্রচেষ্টা বা সাফল্যকেই নশ্বর আখ্যা দিয়ে অবিনশ্বরের সাধনায় মগ্ন থাকার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে— সেখানেই বহু রাজ-রাজড়াকেই বাস্তব প্রয়োজনে কিছুটা ছাড় বা অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমার

দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে।

চাণক্য পর্ব :

হ্যাঁ, খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থানের সময় মহামন্ত্রী চাণক্যের কথা আলোচনা করব। তুমুল বাস্তববাদী কূটকৌশলী এই ক্ষুরধার ব্যক্তিত্বকেই জগৎজয়ী আলেকজাণ্ডারের উত্তরসূরিদের ভারত থেকে বিতাড়নের গৌরব দেওয়া হয়েছে। মৌর্য সাম্রাজ্যের রমরমাও তাঁরই হাত ধরে। উত্তর ভারত থেকে বহিঃশত্রু বিতাড়নের এই পর্বের পর তিনিই সর্বপ্রথম একই রাজত্বের আওতায় সমগ্র উপমহাদেশকে সংযুক্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর অর্থশাস্ত্রে মুনশিয়ানার সঙ্গে চাণক্য নির্মাণ করেছেন সেই রাষ্ট্রতত্ত্ব যেখানে বিবৃত হয়েছে কীভাবে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়। তারপর তার রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনাকে নির্মূল করার পাশাপাশি আশপাশের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ওপর কড়া নজর রাখাও বাধ্যতামূলক। এইবার উপযুক্ত শক্তি ও সময় এলেই তাদের গ্রাস করা। চাণক্যের এই কূটনৈতিক প্রায়োগিক কৌশলের প্রবাদপ্রতিম গ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্র' কি নিপুণভাবে নির্মাণ করেছে বাস্তবে রাষ্ট্র পরিচালনার দুরূহ কৌশল। এখানে কিন্তু আধ্যাত্মিক মতবিরোধের বা তর্কবিতর্কের কোনো চর্চা নেই। কৌটিল্যের মতে ক্ষমতাই হলো সর্বশেষ গন্তব্য। এই ক্ষমতা সর্বদাই ছিল বহুমাত্রিক। আর ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুগুলি ছিল একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। তাঁর কথায়, কল্পিত একটি অবস্থায় সমস্ত উপাদানগুলিই ভয়ঙ্করভাবে প্রাসঙ্গিক। তাদের সঠিকভাবে পরিমাপ বা হিসেব করে নেওয়া যায় এবং প্রয়োজনমাফিক নিজের মতো করে ম্যানিপুলেট করে নির্দিষ্ট নেতার অভিষ্ট সিদ্ধির পথে ব্যবহারও করা যায়। ভাবলে বিস্মৃত হতে হয় তিনি নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করেছেন ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ক্ষমতা, কূটনীতি, চক্রান্ত, আইন, কৃষি, সাংস্কৃতিক পরম্পরা, আদর্শ ও জনপ্রিয় মতামত, গুজব ও মিথগুলি ছাড়াও মানুষের দোষত্রুটি এই তাবৎ উপাদানগুলিই একজন প্রাজ্ঞ রাজার নখদর্পণে রাখতে হবে যদি তিনি তাঁর রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত রেখে তার বিস্তারে আগ্রহী হন। মনে হচ্ছে না কি এই একবিংশ শতাব্দীর একজন পেশাদার অর্কেস্ট্রা পরিচালক যেন তাঁর হাতে থাকা বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রগুলির সমাহারের মাধ্যমে একটি ঘন সন্নিবদ্ধ সুর আমাদের উপহার দিতে চলেছেন।

এখানেই উল্লেখ করতে হয় ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের ভাবনান্তরে আসার শতাব্দী আগেই আজকের বহু চর্চিত 'ব্যালেন্স অফ পাওয়ার'কে দুয়ো দিয়ে চাণক্য অর্থশাস্ত্রে সেই তুল্যমূল্য চিন্তা বিশ্লেষণ করে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন তাঁর রাষ্ট্রচক্র তত্ত্বের যা 'Circle of States' নামে পরিচিত। শাসক যে পদ্ধতি অনুসরণের কথাই বলুন না কেন আদতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হবে নিজ স্বার্থেই পড়শি দেশকে আয়ত্তাধীন করা দরকার। তার অস্তিত্ব বাঞ্ছনীয় নয়। আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি একটি স্বয়ংক্রিয় পরিণতি কোনো নৈতিকতার ভাবনা এখানে অপ্রয়োজনীয়।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের কূটনীতিকরা যাকে Covert operation বা চোরাগোপ্তা কাজকর্ম আখ্যা দেন চাণক্য তাকেই অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের এক প্রয়োজনীয় আয়ুধ হিসেবে চিহ্নিত করে গেছেন। এর ব্যাখ্যায় গিয়ে তিনি বলছেন, এই প্রক্রিয়া (Covert operation) কিন্তু রাষ্ট্রের বন্ধু বা শত্রু নির্বিশেষেই জারি থাকবে। এই কাজে লোক নিতে হবে পুণ্যবান ও দয়ালুদের থেকে, ভ্রাম্যমান সাধুদের মধ্যে, যাদুকর বা হঠযোগী, শকট চালক বা ভবঘুরে এমনকী জ্যোতিষীরাও বাদ যাবেন না। এই এজেন্টরা ক্ষেত্রবিশেষে গুজব ছড়িয়ে দেবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরে। তারা অন্তর্ঘাত চালাবে শত্রু সেনাবাহিনীর মধ্যে। আর ঠিক মওকায় তাদের নিয়োগকর্তা অর্থাৎ সম্রাটের শত্রুপক্ষকে নিধন করবে। ধন্য হাজার বছর আগেকার কূটকৌশল! ধন্য সেই মস্তিষ্কচর্চা!

চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের নির্দেশে আত্মসংবরণ ও মানসিক ব্যবহার ক্ষেত্র বিশেষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং কৌশলগতভাবে আদর্শ। যেমন যে রাজা তাঁর প্রজাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন তিনি তাঁদের সমর্থন হারাবার জন্য যেন তৈরি থাকেন। আর এই অনুমোদন বা সমর্থনহীনতা বাড়তে বাড়তেই দেখা দেবে বিদ্রোহ অনেকক্ষেত্রে আগ্রাসন। শুধু তাই নয়, যদি কোনো বিজয়ী রাজা বিজেতা দেশের প্রচলিত বিশ্বাস, রীতিনীতি বা আদর্শগুলি বিনষ্টের চেষ্টা করেন তাঁর তীব্র বাধার সম্মুখীন হওয়া অনিবার্য।

আমার মনে হয়েছে রাষ্ট্রনৈতিক সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে এই অর্থশাস্ত্র একটি বিশদ ও আকর গ্রন্থ। যে জন্য বিংশ শতাব্দীর রাজনীতি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ম্যাক্সওয়েবার (Maxwebber) বলেছেন, কৌটিল্য আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিশ্বখ্যাত ম্যাকেয়াভেলিকে বহু ছাড়িয়ে গেছেন।

শেষ করার আগে বলব খৃস্টপূর্ব তিন শতকের সম্রাট অশোকের আমলে ভারত সাম্রাজ্য তাঁর সর্বকালীন ভৌগোলিক সীমায় পৌঁছেছিল। অর্থাৎ অশোকের শাসনাধীন ছিল আজকের বাংলাদেশ, পাকিস্তান শুধু নয়, আফগানিস্তান ও ইরানের বিরাট অংশ। আমি জানি না ব্যাপারটা চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের অনুশাসন অনুসরণে ঘটেছিল কিনা, না এটা নিছক কাকতালীয়।

(প্রখ্যাত মার্কিন কূটনীতিবিদ ড. হেনরি কিসিংগার-এর লেখা 'ওয়ার্ল্ড অর্ডার : রিফ্লেকশান অব দি ক্যারেক্টার অফ নেশনস অ্যান্ড দি কোর্স অফ হিস্ট্রি'-র অংশবিশেষের বঙ্গানুবাদ)

পরিকাঠামোর অভাবে চকচকা শিল্পাঞ্চল এখন সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্য

বাসুদেব পাল

স্বাধীনোত্তর (১৯৪৭ পরবর্তী) ভারতে উত্তরবঙ্গে শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা থাকলেও তা গড়ে ওঠেনি। মালদা জেলার আম, উত্তরদিনাজপুর জেলার তুলাইপাঞ্জি চাল, স্বপ্নসুন্দরী দার্জিলিং, ডুয়ার্স অঞ্চল জুড়ে বিরাট অভয়ারণ্য— এতগুলো সদর্থক দিক থাকা সত্ত্বেও ডান-বাম-পরিবর্তন— কোনো সরকারই শিল্পকে গুরুত্বই দেয়নি। উল্টে শাসকদল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্বাচনী ভোটব্যাঙ্ক-এর স্বার্থে আন্দোলনে ঘৃতাহুতি দিয়ে শান্তিপ্রিয় মানুষের উত্তরবঙ্গে বেড়াতে আসার পথটাই রুদ্ধ করে দিয়েছিল। আন্দোলনের ফলে প্রবাসে আটকে যাওয়ার ভয়টা এখনও কাটেনি। বরং মানুষ দার্জিলিং-ডুয়ার্স-এর বদলে সিকিম- গাংটকই বেশি পছন্দ করছেন।

উত্তরবঙ্গের ব্যস্ততম রেলস্টেশন নিউ জলপাইগুড়ি। ট্রেনের সংখ্যা বেড়ে চললেও বাড়েনি যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা— এমনকী প্লাটফর্মের সংখ্যাও। নেই প্রি-পেড অটো বা ট্যাক্সি পরিষেবা। ফলে দালাল ও ফড়েদের চালু ভাড়ার অনেক বেশি ভাড়া গুণে ছোটগাড়ি এবং হোটেলে গিয়ে থাকতে হয় যাত্রীদের। প্রতিবাদ করলে পদে পদে অপমানিত হওয়া। স্টেশনে ঠগদের বিরাট ছবির সঙ্গে সাবধানবাণী লেখা থাকলেও উপরোক্ত ঠগদের মোকাবিলা করা নতুন লোকদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সরকারি অতিথিশালার নাগাল পাওয়া সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। অথচ, ঠিকমতো সরকার নজর দিলে উত্তরবঙ্গে পর্যটন শিল্পের বিরাট সম্ভাবনা যা উত্তরের অর্থনীতিকে পুষ্ট করতে পারত। এজন্য স্বল্পমূল্যে বা ন্যায্যমূল্যে নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন লাগোয়া যাত্রীনিবাসের নিতান্ত প্রয়োজন। রেলের জমিও বেহাত হচ্ছে, ইদগা ময়দানে পরিণত হচ্ছে। সরকারের মন্ত্রী-সান্ত্রীদের জন্য সার্কিট হাউস বা বিভিন্ন বাংলো রয়েছে। কিন্তু মা-মাটি-মানুষের সরকার যে সাধারণ মানুষের কথা ভাবছেন তার কোনো লক্ষণ নেই।

বিভিন্ন শিল্পের জন্য তৈরি করা শেড পড়ে রয়েছে।

চা-বাগান বাদ দিলে বড় অন্য শিল্প কারখানা প্রায় চোখেই পড়ে না। শিলিগুড়ি মাটিগাড়ার হিমূল দুগ্ধ প্রকল্প নাভিশ্বাস উঠেছে। সুযোগে অন্যান্য কৃত্রিম দুগ্ধ প্লাস্টিক প্যাকেটের বাজার দখল করছে। অন্যদিকে প্রতিদিন হাজারে হাজারে গোরু পাচার হয়ে বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে।

কুচবিহার শহর থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে বাম আমলে একটি শিল্পাঞ্চল স্থাপনের প্রয়াস হয়েছিল। চকচকা শিল্পাঞ্চল। ওখানে বামফ্রন্টের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এক পাটকলের শিলান্যাস করেছিলেন। বাস্তবায়িত আর হয়ে ওঠেনি, না বাম রাজত্বে না পরিবর্তনের মা-মাটি-মানুষের সরকারের আমলে। পরে জুটমিলের বরাদ্দকৃত জমিতে অন্য প্রকল্প হয়— কোল্ডস্টোর, অ্যালুমিনিয়াম কারখানা, রুটি কারখানা। ১৯৯৪ সাল নাগাদ চকচকা শিল্পাঞ্চলের সূত্রপাত হয়েছিল। তখন মাত্র ৩/৪টি শিল্প হয়েছিল। ধীরে ধীরে স্থানীয় ও বাইরের শিল্পপতিরা শিল্প-কারখানা গড়তে শুরু করেন। কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হয়। এলাকায় নাগরিক সুযোগ-সুবিধার জন্য এলাকায় রাজ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলাপমেন্ট কর্পোরেশন রাস্তাঘাট, পানীয় জল ও বিদ্যুৎ পরিষেবার পরিকাঠামো তৈরি করে। কুচবিহার ২নং ব্লকের চকচকা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৪২টি কারখানায় প্রায় ১৯ বাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান হলেও ৭-৮টি শিল্প চালু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই

বন্ধ হয়ে যায়। মোট ৬২টি শিল্পস্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। ২০০৮ সালে বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন ৩৬ একর জমির উপর জুট-পার্ক স্থাপনের জন্য শিলান্যাস করেছিলেন। কিন্তু কাজ আর এগোয়নি। নতুন রাজ্য সরকারও ওই ৩৬ একরে জুট-পার্ক তৈরি করবে বলেছিল। এখনও কিছুই হয়ে ওঠেনি। সেখানে গোরু-ছাগল চরে বেড়ায়। ফুটবল, ক্রিকেট ম্যাচ এবং রাজনৈতিক দলের সভার স্থান হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

চকচকার কোনো রাস্তাই আদৌ চকচকে নয়। রাস্তাও মেরামত হয়নি। এ ব্যাপারে লরিচালক অসীম দাস মনের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। একটি নির্মীয়মান অতিথিশালার কাজ কয়েক বছর আধখ্যাচড়া হয়ে পড়ে আছে। এলাকাটি সমাজ বিরোধীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ। রাস্তায় ল্যাম্পপোস্ট থাকলেও বেশিরভাগ সময়ে বালাই থাকে না। অল্প-সল্প যে কয়েকটি শিল্প চালু হয়েছে তারও শ্রমিক মালিকরা নিরাপত্তা নিয়ে সতত শঙ্কিত। এক সময়ে পুলিশের টহল, পুলিশ-ফাঁড়ি ছিল। গত পাঁচ বছরে সেসবই অদৃশ্য। মালিক, শ্রমিক, মা-বোন--- সবাই নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে তাঁরা ন্যূনতমপক্ষে আলোর ব্যবস্থা আশা করেন। কাকস্য পরিবেদনা, সবই ভগবান ভরসা। কার্যত, সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত।

কলকাতার কিছু ছোট-খাটো শিল্পপতি তেলকল, চালকল, পাটকল স্থাপন করলেও তেমন বড় শিল্পোদ্যোগ নেই। আগের কেন্দ্র সরকার নর্থ-ইস্টার্ন ডেভালাপমেন্ট কাউন্সিল তৈরি করে অসম-সহ সমগ্র উত্তরপূর্বাঞ্চলকে করমুক্ত ক্ষেত্র ঘোষণা করেছে অনেক আগে। অথচ প্রায় একইরকম পরিবেশ ও সমস্যা থাকা সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিং জেলা করমুক্ত হয়নি। ফলে ছোট ও মাঝারি শিল্পেরই নাভিশ্বাস উঠছে। রয়েছে পুকুর, গাছপালা। পুকুরগুলো সংস্কারের অভাবে মজে যেতে বসেছে। নেই কোনো দমকল কেন্দ্র। সবই জেলা কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল।

চকচকা শিল্পাঞ্চলে কুচবিহারের জন্য কিছু কর্মসংস্থানের সুযোগ হলেও তবে সারা জেলার হিসেবে কোনো প্রভাব পড়েনি। কুচবিহার শিল্পবিকাশ কেন্দ্র সূত্রে খবর, এবছর পাটের জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছিল। সেইমতো একটি কোম্পানি শিল্পাঞ্চলে কাজ করতে গিয়েছিল। অভিযোগ, গ্রেটার কোচবিহার পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশান তাদের কাজই করতে দেয়নি। বর্তমানে কাজ বন্ধ।

প্রায় দু'কোটি টাকার প্রকল্প। একথা জানিয়েছেন ডব্লিউ বি আই ডি সি-এর এক কর্তা, ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকেই গেছে। উত্তরবঙ্গে অন্ধকার কাটেনি। সবাই আলোর অপেক্ষায়। ■

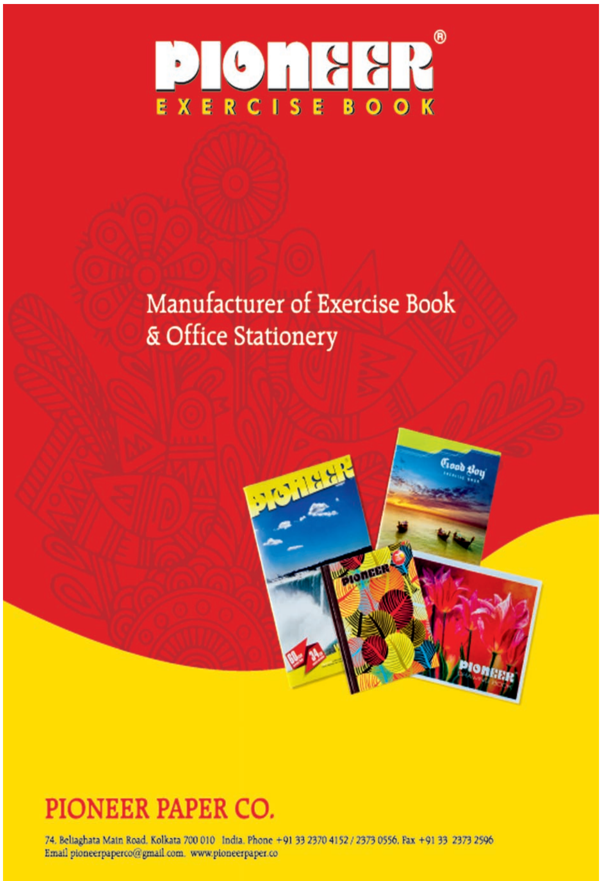

আইনি সন্ত্রাস

তারক সাহা

'সন্ত্রাস' শব্দটির অর্থ কি? এর অর্থ হলো কোনো মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর কার্যকলাপের ফলে অন্য মানুষ বা গোষ্ঠী সন্ত্রস্ত, অপদস্থ বা এমন ক্রিয়াকলাপের ফলে শান্তিভঙ্গ বা মৃত্যু ঘটে তা হলো সন্ত্রাস। এই প্রতিবেদনের শুরুতে 'আইনি সন্ত্রাসে'-র চেহারা কেমন হয় তার একটা ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। কাহিনিটা শোনা আমার এক পরিচিতের কাছে। বেশ কয়েক বছর আগে ওই পরিচিত ভদ্রলোকটিকে যেতে হয়েছিল 'আলিপুর জেলে'। সেখানে তার সঙ্গে পরিচয় হয় 'আইনি সন্ত্রাসে' ফেঁসে যাওয়া এক যুবকের। বছর তিরিশ- বত্রিশের এই যুবককে 'আইনি সন্ত্রাসে' ফাঁসিয়ে পুরাতন প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যায় তার তিন বছরের পুরাতন বিবাহিতা স্ত্রী। নিরপরাধ যুবকটি বিনা কারণে, বিনা জামিনে, বিনা বিচারে জেল খাটছিল আর মাঝেমধ্যেই কাঁদত সে দাগি আসামিদের সঙ্গে।

হ্যাঁ, এই আইনি সন্ত্রাসের নাম ধারা ৪৯৮ এ। পতিগৃহে নারী নির্যাতনের উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে নারী পরিত্রাণের জন্য আইনটি দেশের ভারতীয় ফৌজদারি এবং দণ্ড সংহিতায় সংযোজিত হয়েছিল। কিন্তু তিন দশক যেতে না যেতেই এই আইনের মারপ্যাঁচে নাভিশ্বাস উঠছে বিবাহিতা নারীদের শ্বশুরকুলে।

এই আইনের উৎস হলো বৈবাহিক জীবনে নারী নির্যাতন। এটা তো ঠিক, বহুদিন ধরে শ্বশুরকুলের সদস্যরা অতিরিক্ত পণ আদায়ের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার অত্যাচার করে আসছে। অত্যাচারিতার মৃত্যু হয়েছে বহু ক্ষেত্রে।

তারই রক্ষাকবচ হিসেবে এই ৪৯৮ এ। জামিনযোগ্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধের মৌলিক পার্থক্য হলো জামিনযোগ্য অপরাধে বিচারক

অপরাধীকে জামিন দিতে বাধ্য, কিন্তু জামিন অযোগ্যর ক্ষেত্রে জামিন গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করা পুরোপুরি বিচারকের মর্জির ওপর। বাস্তবে বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে জামিন অযোগ্য ধারা প্রযুক্ত হয়েছে অথচ অপরাধ লঘু তবুও বিচারক অপরাধীর জামিন অগ্রাহ্য করেছে, পরে উচ্চ আদালতে গিয়ে অপরাধীর জামিন হয়েছে।

ঠিক এমনটাই ঘটে থাকে ৪৯৮ এ ধারার ক্ষেত্রে। 'তোলো আর জেলে পোরো' এমন ধারার অপব্যবহারই ঘটছে আজকাল। দুর্নীতিপ্রবণ পুলিশকে অনেক সময়ে উৎকোচ দিয়ে ধনী ও প্রভাবশালী পরিবারের মহিলারা অন্যায়ভাবে শ্বশুরকুলকে টিট করতে ৪৯৮ এ ধারা প্রয়োগ করেছে। উল্টো ঘটনাও ঘটেছে। প্রভাবশালী শ্বশুরকুল বধূ হত্যা করে দেহ ঝুলিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিয়েছে।

সুতরাং, ৪৯৮ এ ধারায় পুলিশকে অফুরন্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে সামান্যতম ক্ষমতা যার বা যাদের আছে তারাই উৎকোচ চায়। কাজেই বিনা ওয়ারেন্টে শ্বশুরকুলকে টাইট দিতে পুলিশ প্রায়শই উৎকোচ গ্রহণ করে থাকে। অথবা গ্রহণযোগ্য অপরাধ না থাকলেও অনেক সময়ে পুলিশ উৎকোচ গ্রহণ করে থাকে। অথবা গ্রহণযোগ্য অপরাধ না থাকলেও অনেক সময়ে পুলিশ ৪৯৮ এ ধারায় পাত্রকুলকে বিব্রত করে।

তাই এইসব মহিলা ও পুলিশি নির্যাতন রুখতে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে আগামী দিনে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত না করে পুলিশ কাউকে হুটহাট গ্রেপ্তার করতে পারবে না। দিন বদলেছে, সামাজিক মানসিকতাও বদলাচ্ছে আর বদলাচ্ছে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ। তাই আইন প্রণেতারা নারীদের রক্ষাকবচ হিসেবে প্রদীপ জ্বালিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু প্রদীপের ঠিক নীচের আঁধার ঘোচাতে কোনো ব্যবস্থা নেননি। আজকের সমাজে সব পুরুষই প্রেমচোপড়া বা সব নারীই নিরূপমা রায় নয়।

আজ বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তাদের পুত্র-পুত্রবধূ দ্বারা যেভাবে নির্যাতিত হয়ে আদালতের

দ্বারস্থ হচ্ছেন সেখানে যে পুত্ররা দায়ী এমনটা নয়, বরং বধূ দ্বারা নির্যাতিত পুরুষ আপন পিতা-মাতার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। এরকমই এক ঘটনার উল্লেখ করাটা এখানে অনভিপ্রেত হবে না।

আমার এক বন্ধুকে বাধ্য হয়ে তার পিতামাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাতে হয়েছে। বৃদ্ধ পিতামাতার একমাত্র সন্তান আমার বন্ধু। সে আবার বিয়ে করেছে পিতামাতার একমাত্র কন্যাকে। কৌশলে শ্বশুর- শাশুড়িকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে নিজের মাকে আনতে চায় বধূটি। বেশ কিছুদিন অশান্তি চালাবার পর সিন্থেটিক শাড়ি পরে বধূটি হাতে মোমবাতি জ্বালিয়ে আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে ৪৯৮ এ ধারা প্রয়োগ করতে চায় স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ির বিরুদ্ধে। অগত্যা পিতামাতার উপদেশে তাঁদেরই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে বধূর অভীষ্ট পূরণ করে বন্ধুবরটি। যে মোমবাতি দিল্লী বা কামদুনি নারী নির্যাতনের প্রতিবাদী মানুষের প্রতীক, সেই মোমবাতি আবার শ্বশুর-শাশুড়ির নিজভূমি থেকে উৎখাতের নিদর্শন হয়ে রইল।

ক্রাইমব্যুরো পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৩ সালে দেশে পারিবারিক কলহের জেরে বিবাহিত পুরুষদের আত্মহত্যার সংখ্যা বিবাহিতা মহিলা আত্মহত্যার প্রায় দ্বিগুণ। গত বছর সারা দেশে গড়ে প্রতি সাড়ে আট মিনিটে একজন স্বামী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। অন্যত্র মেয়েদের ক্ষেত্রে ওই একই কারণে আত্মঘাতীর ঘটনা ঘটেছে সাড়ে এগারো হাজারজনের ক্ষেত্রে। তাহলে উপরোক্ত পরিসংখ্যান বলছে পুরুষদের ক্ষেত্রে কোনো মতেই সমস্যা লঘু তো নয়ই বরং গুরুতর।

মৃত্যু সর্বদাই দুঃখজনক এবং আত্মহনন এক সামাজিক ব্যাধি। কিন্তু সমস্যা যে ক্রমশ গম্ভীর হচ্ছে তা জানা যাচ্ছে ২০১২ থেকে ২০১৩ এই একবছরে দায়ের হওয়া মামলা বৃদ্ধির দিকে তাকালেই। শুধু এক বছরেই জাতীয়স্তরে ওই ধারায় মামলা বেড়েছে সাড়ে এগারো শতাংশ। এরাজ্য শিল্পে পিছিয়ে থাকলেও ৪৯৮ এ ধারায় মামলায় পিছিয়ে নেই। সারা দেশে ১১.৪ শতাংশ মামলা বাড়লেও এ রাজ্যে ওই সময়ে বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি। অথচ সারাদেশে ওই মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র আড়াই শতাংশের। সারাদেশেই অন্যান্য বছরের মতো ২০১৩ সালেও এই ধারায় কোনো মামলারই সমাধান হয়নি। এযাবৎ সমগ্র দেশে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ।

অনেকটাই বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। তিন দশক আগে আইন তৈরি হলেও অনেক নির্যাতিতাই আইনের কোনো ফলই পৌঁছয়নি। অনেক সময়ে সংসারের ঝগড়া-ঝাঁটির সংবাদ স্থানীয় থানা পর্যন্ত পৌঁছায় না। দৈহিক অত্যাচার ছাড়া মানসিক অত্যাচারের ঘটনা বাড়ির চৌকাঠও পেরোয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও শহুরে বা গ্রামীণ ধান্দাবাজ বধূরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডোমেস্টিক ভায়লেন্সের ধারায় মামলা রুজু না করেও অধিকতর শক্ত ধারা ৪৯৮ এ মামলা রুজু করছে অথবা ওই ধারায় মামলা করবে বলে শাসিয়ে নিজের কাজ হাসিল করছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। এর মধ্যে মেয়েরা যে ক্ষেত্রে এই ধারা প্রয়োগের ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করে সেই ক্ষেত্রগুলি হলো— (১) পরকীয়া প্রেম বিবাহের আগে বা পরে, (২) পূর্বোক্ত ঘটনার মতো স্বামীকে বাধ্য করা তার মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে বা অন্যত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করতে, (৩) বিবাহপূর্ব অসুস্থতা বা শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত কোনো তথ্য ফাঁস হয়ে গেলে তা ধামাচাপা দিতে ব্ল্যাকমেল করতে ইত্যাদি হরেক রকম ক্ষেত্রে। এনজিও-র কাছে এমন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে কোনো কোনো মহিলা বিয়ের পিঁড়িতে নাকি বসছেন স্রেফ শ্বশুরবাড়িকে এই ধারায় হেনস্থা করবে বলে।

ভারতীয়দের এই নিন্দাজনক কাজের কুফল দেশের গণ্ডি পেরিয়ে সাত সমুদ্র পারের দেশগুলিতেও পৌঁছেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু' ঘোষণা করেছে, এদেশে বয়স্কদের নিগ্রহের অন্যতম বড় কারণ ৪৯৮ এ ধারার অপপ্রয়োগ। মার্কিন প্রশাসন, কানাডা প্রশাসন তাদের নাগরিকদের যারপরনাই সতর্ক করে বলেছে যে, কোনো পুরুষ নাগরিক কোনো ভারতীয় মহিলার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে যেন দু'বার ভাবে। কারণ সেই ৪৯৮ এ ধারা।

সারাদেশ তো বটেই পৃথক করে দেখলে এই রাজ্যে সমস্যা তীব্রতর হচ্ছে। রাধিকানাথ মল্লিকের নেতৃত্বাধীন 'পীড়িত পুরুষ পরিষদে'র বক্তব্য হলো— বহু নির্দোষ পুরুষ এবং তাদের পরিবার এই ধারার শিকার। শুধু একটা অভিযোগ-ই তছনছ করে দিচ্ছে সুন্দর কোনো পরিবারের স্বামী, ননদ, শাশুড়ি, শ্বশুর প্রমুখের সম্পর্ক। শুধু তাই নয়, জাঁদরেল মহিলার আচরণে কেবল পরিবারই বিধ্বস্ত হচ্ছে এমনটা নয়, বরং মহিলারা তাদের পূর্ব স্বামীর সন্তানকে ফেলে অন্য পুরুষের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছে। ভাবুন একবার! এতে তো নষ্ট হচ্ছে নবাগত সন্তান-সন্ততিদের ভবিষ্যৎ। শুধু এই ধারায় বিদ্ধ হয়েই ২০১৩ সালে প্রায় ৪৮ হাজার মহিলা গ্রেপ্তার হয়েছেন।

৪৯৮ এ ধারার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠছে, আইন সমাজের জন্য নাকি সমাজ আইনের জন্য। যদি আইন সমাজের জন্য হয় তবে মানুষের মানসিক দিক পরিবর্তন দরকার। এজন্য প্রয়োজন কাউনসেলিং। ৪৯৮ এ ধারা থাক, কিন্তু বদলাক এর প্রয়োগ বিধি। এই ধারাটি বর্তমানে 'লিগ্যাল টেররিজম' বলে সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা ভর্ৎসিত হলেও একে 'লিগ্যাল হারমোনিজমে' পরিণত করা যায়। এজন্য বিচারক, বাদী, বিবাদী উকিল কিংবা এনজিগুলির সক্রিয় ভূমিকা দরকার। ৪৯৮ এ যেমন নির্যাতিতাদের পক্ষে বাঁচার দীপশিখা জ্বালিয়েছে, তেমনই দীপশিখার ঠিক নীচে যে আঁধার রয়েছে তা ঘোচাবে কে? এটা কার দায়িত্ব— সমাজ ভেবে দেখুক। ■

অন্য রকম

পুনসারী—মডেল ভিলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারতের ৭২ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। সেজন্য গ্রাম বিকশিত হলে দেশ উন্নত হবে। ভারতে সবচেয়ে ছোট ও শক্তিশালী একক গ্রাম। আদিকাল থেকেই ভারতবর্ষ গ্রাম গণরাজ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর সেজন্যই ভারত বিশ্বগুরু আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। ইংরেজ এদেশে আসার আগে রাজারা গ্রামব্যবস্থা অটুট রেখেছিলেন।

১৯৮৯ সালে সারা দেশে প্রত্যেক জেলায় একটি গ্রাম সমগ্র গ্রাম বিকাশের জন্য চয়ন করার কথা বলা হয়েছিল। তখনই গুজরাট রাজ্যের আমেদাবাদ শহরের কিছু দূরে

আদর্শ গ্রামের স্বাগত তোরণ।

পুনসারী গ্রামের যুবকরা কাজে নেমে পড়েছিলেন। আজ ২৫ বছর পর সেই পুনসারী গ্রাম 'মডেল ভিলেজ' রূপে দেশের মানুষের নজরে এসে গেছে। আজ ওই গ্রামে পাকা রাস্তা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, শুদ্ধ পানীয় জল ও নিকাশি ব্যবস্থা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়েছে। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা এবং পুরো গ্রামে ওয়াইফাই-এর সুবিধা আছে।

গ্রামের সরপঞ্চ (গ্রামপ্রধান) হিমাংশু প্যাটেল জানান— ''ছ' হাজার জনবসতির গ্রামে প্রতি ঘরে বিদ্যুতের আলো ও পানীয় জলের সুবিধা আছে। নিকাশি ব্যবস্থার জন্য আন্ডারগ্রাউন্ড পাকা ড্রেন আছে। গ্রামের দূষিত জল শোধন করে চাষের কাজে লাগানো হয়। সবথেকে বড় কথা, গ্রামে মিনারেল ওয়াটারেরও আলাদা ব্যবস্থা আছে। এক কথায় আমাদের গ্রাম একটি 'স্মার্ট ভিলেজ' রূপে মান্যতা পেয়েছে।''

প্যাটেল আরো বলেন, পুরো গ্রামে স্থানে স্থানে সিসিটিভি লাগানো আছে, তার ফলে গ্রামের যে কোনো গতিবিধি দপ্তরে বসেই আমরা দেখতে পাই। আমার স্মার্টফোনেও সারা গ্রামকে দেখতে পাই। সারা গ্রামে ১৫৩টি লাউডস্পিকার লাগানো আছে, যার দ্বারা যে কোনো ঘোষণা বা সূচনা গ্রামের লোক বাড়িতে বসেই শুনতে পান।

স্মার্ট ভিলেজের সরপঞ্চ হিমাংশু প্যাটেল খুবই স্মার্ট। তাঁর কাছে ৫টি আইফোন রয়েছে। সেগুলির স্ক্রিনে গ্রামের সুযোগ সুবিধা যুক্ত অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ও স্মার্ট স্কুল রূপে সরকারের স্বীকৃতি পেয়েছে। হিমাংশু প্যাটেল তাঁর দপ্তরে বসেই বড় স্ক্রিনে স্কুলকেও মনিটর করেন। স্কুলের প্রিন্সিপাল ভগবৎ বাহন প্যাটেল জানান যে এটা স্মার্টস্কুল কেন? এখানে কোনো ছাত্রছাত্রী মাঝপথে পড়া ছেড়ে দেয় না এবং স্কুলের ফল রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হয়। এটা স্মার্টস্কুলে এজন্যই যে, এখানে ছোট শিশুরাও কমপিউটার অপারেট করতে জানে।

গ্রামকে স্মার্ট ভিলেজ তৈরি করতে কত টাকা খরচ করা হয়েছে? প্রশ্ন করা হলে হিমাংশু প্যাটেল বলেন— ২০০৬ থেকে ২০১২ পর্যন্ত সমস্ত যোজনার জন্য ১৪ কোটি টাকা এসেছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের গ্রামীণ যোজনা খাত থেকে। সরকারি অর্থ খরচ করেও গ্রামের উন্নতি করা যায় এটা আমরা প্রমাণ করেছি।''

বস্তুতপক্ষে পুনসারী গ্রামবিকাশ সমিতির উদ্দেশ্যে ছিল রুজি রোজগারের জন্য গ্রাম থেকে শহরে যাওয়ার প্রবণতা বন্ধ করা। হিমাংশু প্যাটেল জানান— গ্রামের লোক যারা উপার্জনের জন্য বাইরে চলে গিয়েছিল তারা সব ফিরতে শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত ২০টি পরিবার মুম্বই থেকে ফিরে এসেছে। আজ গ্রামেই উন্নত পদ্ধতিতে জৈবিক কৃষিকাজ, পশুপালন, কুটিরশিল্প সবই চলছে। গ্রামবাসী সুখে দিনাতিপাত করছে।

হিমাংশু প্যাটেল জোরের সঙ্গে বললেন— আজ যেভাবে কেন্দ্র ও কোনো কোনো রাজ্য সরকার গ্রাম বিকাশের জন্য তৎপর হয়েছে তাতে আশা করা যাচ্ছে স্মার্ট গ্রামের সংখ্যা অনেক বাড়বে।

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

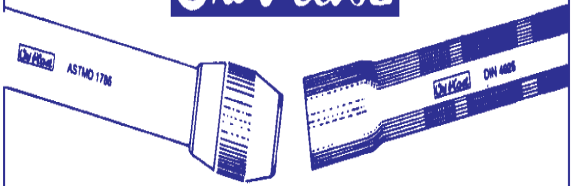

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"শুধুমাত্র গীর্জাগুলি নয়, কিন্তু য়ুরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহও একদিন ভারতবর্ষের চিন্তাবিদদের নামে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবে। একদিন এইসব চিন্তানায়করা অরণ্যের বৃক্ষাচ্ছায়ে চীরধারণ করে অথবা সামান্য পরিচ্ছেদে আবৃত হয়েও সত্যসমূহকে উপলব্ধি করেছিলেন, সে নিগূঢ় ও সর্বাত্মক মহান সত্যকে, জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মূঢ়ভাবে আসক্ত য়ুরোপ কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

জল চিকিৎসা

ডাঃ সুরেশ দেওরানী

মানুষের শরীরের ওজনের দুই তৃতীয়াংশ ভাগ জল এবং কেবল এক তৃতীয়াংশ ভাগ বাকি সব। বায়ু ছাড়া শরীরের দ্বিতীয় বড় প্রয়োজন জলের। জল ছাড়া শরীর বেশিদিন চলতে পারে না। দাঁতকে শরীরের নিরেট পদার্থ বলা হয়। তাতেও দশ শতাংশ জল থাকে। হাড়ের মধ্যে ১৪ শতাংশের বেশি জল থাকে।

শরীরে জলের প্রধান কাজ হজম প্রক্রিয়াকে সহায়তা করা। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপকে সুষ্ঠুভাবে সঞ্চালিত করা। জল শরীরের ভিতরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য অবিরত ক্রিয়া করে। শরীরে জলের অভাবে পেটে গ্যাস, বুক জ্বালা, পেটে আলসার, অন্ত্রের রোগ, ক্লান্তি ও লু লাগার বেশি সম্ভাবনা থাকে। জলের জন্যই মানুষ ছয় প্রকার রস— মিষ্টি, টক, নোনতা, তিতা, ঝাল ও কষায়— আলাদা আলাদা স্বাদ অনুভব করতে পারে।

সেজন্য আমাদের জানা দরকার জলের ব্যবহার কখন ও কীভাবে করা হবে। কতটুকু ও কখন জল পান করতে হবে। শুদ্ধ, পরিষ্কার ও পরিশ্রুত জল শরীরের তাপমাত্রার অনুকূল ও উপযোগী হয়। জল যত ধীরে ধীরে ও একটু একটু করে পান করা যায় তত বেশি উপকারী হয়।

চাণক্যনীতিতে বলা হয়েছে—

‘অজীর্ণং ভেষজং বারি জীর্ণ বারি বলপ্রদম্।

ভোজনে চামৃতংবারি ভোজনান্তে বিষপ্রদম্।।

অর্থাৎ অজীর্ণ হলে জল পান করা ঔষধের কাজ করে, ভুক্ত দ্রব্য হজমের পর জল পান করা বলকারক হয়, ভোজনকালে অল্প জল পান করা অমৃততুল্য হয় এবং ভোজনের অব্যবহিত পরে জল পান করা বিষতুল্য হয়। ভোজনের একেবারে আগে জল পান করলে খিদে নষ্ট হয়ে যায়। ভোজনকালে প্রয়োজন হলে একটু জল পান করা যায় এবং খেয়েই সঙ্গে সঙ্গে জল পান করলে হজমে বিঘ্ন ঘটে। সুতরাং খাওয়ার দেড় থেকে দু’ ঘণ্টা পরে যত খুশি জলপান করা যায়।

সকালে খালি পেটে জল পান করাকে ঊষাপান বলা হয়। ঊষাপান ঘুম থেকে উঠেই বাসীমুখে করলে বেশি উপকার হয়। রাত্রে তামার পাত্রে রাখা জল ঊষাপানের পক্ষে খুব উপযোগী। প্রথম দুই গ্লাস দিয়ে ঊষাপান শুরু করতে হবে, পরে ধীরে ধীরে দু’চার মাসে মাত্রা বাড়াতে বাড়াতে চার গ্লাস জল ঊষাপান করতে হবে। জলপান করার ১ ঘণ্টার মধ্যে অন্য কিছু খাওয়া চলবে না। যিনি কোষ্ঠবদ্ধতায় ভুগছেন তাঁকে ঊষাপানের পর কয়েক কিলোমিটার হাঁটাহাটি করতে হবে। ঊষাপানে আমাশয়, শোথ, জ্বর, পেটের রোগ, আন্ত্রিক, স্থূলত্ব, যকৃতের রোগ, নাক থেকে রক্ত পড়া, কোমর ব্যথা, চোখ-কান ইত্যাদি রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

শুদ্ধ জলপানে অনেক লাভ :

▯ শরীরের ভিতরের নোংরা ও গরম দূর করে।

▯ দাঁড়িয়ে পান করলে পেটে গ্যাস, বাত, হাঁটু ব্যথা, সন্ধি ব্যথা ও কানের রোগের সম্ভাবনা। তাই বসেই পান করতে হবে।

▯ পরিশ্রান্ত হয়ে পিপাসার্ত হলে ধীরে ধীরে একটু একটু করে পান করা ভাল।

▯ ভয়, ক্রোধ, মূর্ছা অথবা আঘাত লাগার ফলে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির ক্ষতিকারক ক্ষরণের প্রভাব জলপানে কম হয়।

▯ লু অথবা গরম লাগলে ঠাণ্ডাজল পান এবং ঠাণ্ডা লাগলে গরম জলপান করতে হবে। গরমের সময় জলপান করে বাইরে বেরোলে লু লাগার সম্ভাবনা কমে যায়।

▯ বেশি জল পানে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির ক্ষরণ ঠিকভাবে হয়।

▯ উপবাস করলে পাচনক্রিয়া বন্ধ থাকায় বেশি জলপান করলে শরীরের দূষিত পদার্থ সহজেই বের হয়ে যায়।

▯ পেট ভারী বোধ করা, টক ঢেকুর ওঠা, পেট জ্বালা উপসর্গে ঈষদুষ্ণ জলপান করলে ভালো ফল যাওয়া যায়।

▯ খুব সর্দি লাগলে গলা ও নাকে-মুখে গরম জলের ভাপ নিলে উপকার হয়।

▯ সব সময় তাজা জলেই স্নান করা উচিত। এতে রক্তসঞ্চালন ঠিকমতো হয়ে শরীরে স্ফুর্তি ও শক্তি বৃদ্ধি করে।

সুতরাং জলকে অমৃত মনে করে নিয়মমতো পান করলে শরীর সুস্থ থাকবেই। ■

সংস্কার ভারতীর শিল্পী সম্মেলন

সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ শাখার ২৪তম শিল্পী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো গত ১৫-১৬ নভেম্বর মেদিনীপুর স্টেশন রোড সংলগ্ন শ্যাম ভবনে। মেদিনীপুর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী মিলনানন্দ মহারাজ প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র অভিনেতা জর্জ বেকার, বিজ্ঞানী জিষ্ণু বসু, প্রদেশ সভাপতি অভিনেতা তপন গাঙ্গুলী, অখিল ভারতীয় নাট্যপ্রমুখ বিকাশ ভট্টাচার্য, প্রদেশ কার্যকরী উপদেষ্টা সুভাষ ভট্টাচার্য, প্রদেশ সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায় এবং সম্মেলন সমিতির সভাপতি ড. সুকুমার মাইতি।

সম্মেলনে উন্মোচিত হয় বিকাশ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় ছোটদের জন্য ছড়ার বই-এর সংকলন 'ছড়া ছড়ি-ছড়া' শীর্ষক বইটির। বইটির আবরণ উন্মোচন করেন শিশুশিল্পী ঋষভ দে।

সন্ধ্যায় লোকসঙ্গীত সম্রাজ্ঞী স্বপ্না চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ধ্রুবজিৎ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট অভিনেতা তথা প্রদেশ সভাপতি তপন গাঙ্গুলি, সম্মেলন সমিতির সভাপতি ড. সুকুমার মাইতি-সহ প্রদেশের বরিষ্ঠ কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে সূচনা হয় 'সংহতি ও লোক উৎসবের'।

দ্বিতীয় পর্বের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রথমেই ছিল দক্ষিণ হাওড়া শাখার নিবেদন ভারত আত্মার অগ্নি পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে 'আগুনের পরশমণি'। তনুশ্রী মল্লিকের পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে। 'গীতবিতানে প্রাণ' শীর্ষক নৃত্য-গীতি আলখ্যে রবীন্দ্রনাথের গান অবলম্বন করে প্রাণের কথা পরিবেশন করে উত্তর কলকাতা শাখা। মেদিনীপুর নগর শাখার সার্থক নিবেদন ছিল নৃত্য-গীতের মাধ্যমে ভারতবর্ষের নানান বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের সন্ধান। দক্ষিণ কলকাতা শাখা যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে নৃত্য পরিবেশিত করে 'যখন একা'। বাগুইআটী শাখার অনুনাটক মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'পোকা-মাকড়ের কুটুম্ব' শীর্ষক নাটক। মেদিনীপুর শাখার উদীয়মান শিল্পী সায়নী মাঝির গান। পরিশেষে চন্দ্রকোণা শাখার নটরাজ বন্দনার মধ্য দিয়ে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন রবিবার সকালে পরিবেশিত হয় শাখা অনুসারে সমবেত সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান। এই পর্বেই ধ্রুবজিৎ ভট্টাচার্যের পরিবেশিত দু'টি ভক্তিগীতি। এই সঙ্গে জয়দেব বণিকের সংযোজনায় 'ত্যাগ ও সেবা'-র উপর অঙ্কনের কার্যক্রমও বেশ উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা পরিষদ মঞ্চে সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যাদুসম্রাট পি. সি.

সমাবেশ সমাচার

সরকার (জুনিয়র), লোকসঙ্গীত সম্রাজ্ঞী স্বপ্না চক্রবর্তী, সাহিত্যিক গুরু বিশ্বাস, অখিল ভারতীয় সহ-সংগঠন সম্পাদক আমীর চাঁদজী, শিশুশিল্পী শ্রেয়ান ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য প্রাদেশিক কার্যকর্তাগণ।

শিউড়ি শাখার এক অনবদ্য নিবেদন স্বামীজীর আত্মকথা, কবিতা, গান, জীবনাদর্শের কোলাজ--- 'যুগ দিশারি বিবেকানন্দ'। মেদিনীপুর শাখার কিশোরী শিল্পী দেবাঞ্জনা কর্মকারের সুমধুর কণ্ঠের সঙ্গীত সকলকে মোহিত করে। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প অবলম্বনে হাস্যরসে ভরপুর শ্রুতিনাটক 'সমাজ সেবা মাইকি জয়' সোনারপুর শাখার এক মনোগ্রাহী পরিবেশনা। তেমনি বিকাশ ভট্টাচার্যের রচনা ও পরিচালনায় সংস্কার ভারতীর রেপার্টারির অনুনাটক 'ন হন্যতে' অভিনয় ও উপস্থাপনায় ছিল সফল নিবেদন। ব্যাণ্ডেল শাখার বেহালা ও কণ্ঠসঙ্গীতের যুগলবন্দী ও বাগনান শাখার রাধাকৃষ্ণের প্রেমগাথা নিয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠানও সার্থক প্রযোজনা। বাউড়িয়া শাখা নৃত্যগীতের মাধ্যমে পরিবেশন করে অসমের শিল্প সংস্কৃতির উপর অনুষ্ঠান 'চল যাই অসম'। আমতা ও উত্তরপাড়া শাখার বৃন্দগান ও মেদিনীপুর শহরের কিশোরী নৃত্যশিল্পী শিখাগ্নী মিশ্রের একক নৃত্য।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

শক্তিপুরে পরিবার প্রবোধন সভা

গত ২৬ নভেম্বর দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর খণ্ডের শক্তিপুরে কুটুম্ব প্রবোধনের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ৩০টি পরিবার থেকে ৫৪ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোমপাড়া শিশু মন্দিরের দিদিভাই শ্রীমতী পিঙ্কি গনাই। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিক্ষক অলক দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন শক্তিপুর মহকুমার ব্যবস্থা প্রমুখ সুমন্ত গনাই এবং শক্তিপুর খণ্ড কার্যবাহ অতীশ মণ্ডল। উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কুটুম্ব প্রবোধন প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল হিন্দু জীবন পদ্ধতি, আদর্শ হিন্দু ঘর বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও লাভ জেহাদ, ল্যান্ড জেহাদ, স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার, বিদেশি দ্রব্য বর্জন বিষয়ে নিয়ে আলোচনা হয়।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদা জেলার বগচরা গ্রামের স্বয়ংসেবক এবং বর্তমানে সরস্বতী শিশুমন্দিরের আচার্য উত্তম দাসের মাতৃদেবী প্রীতিরানী দাস গত ২৫ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, উত্তম দাস বেশ কয়েক বছর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্ণকালীন কার্যকর্তা ও সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে কাজ করেছেন।

***

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া জেলার শারীরিক প্রমুখ সুচীব্রত প্রামাণিকের মাতৃদেবী যোগমায়া প্রামাণিক গত ২৩ নভেম্বর দুপুরে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তাঁর প্রয়াণে এলাকার স্বয়ংসেবকরা একজন মাতৃসমাকে হারালো। উল্লেখ্য, তাঁর প্রেরণাতেই তাঁর পাঁচ পুত্রই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক।

***

গত ২০ নভেম্বর সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের বাঁশদ্রোনী প্রভাত শাখার মুখ্যশিক্ষক জয়ন্ত ঘোষালের পিতৃদেব নির্মল চন্দ্র ঘোষাল বার্ধক্যজনিত রোগে ৭৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা-জামাতা ও এক নাতনি এবং অগণিত গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন।

***

গত ২৪ নভেম্বর শিখা হাজরা পরলোকগমন করেছেন। স্বস্তিকা-র মুদ্রক সেবা মুদ্রণের কর্ণধার পার্থ হাজরা ও প্রশান্ত হাজরা-র তিনি মাতৃদেবী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বৎসর। দুই পুত্র ও দুই কন্যা-সহ তিনি নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

পরলোকে প্রবীণ সাংবাদিক অরবিন্দ ঘোষ

প্রবীণ সাংবাদিক অরবিন্দ ঘোষ আর নেই। গত ১৩ নভেম্বর দিল্লীর অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। এক বছরেরও বেশি সময় তিনি রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। তিনি স্ত্রী ও এক পুত্রকে রেখে গেছেন। দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনে বহু পত্রিকার সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। দিল্লী থেকে প্রকাশিত ইংরাজি দৈনিক মাদারল্যান্ড, অর্গানাইজার, হিন্দুস্থান টাইমস-এ তিনি সাংবাদিকতা করেছেন। হিন্দুস্থান সমাচার-এর তিনি কাঠমাণ্ডু-র প্রতিনিধি ছিলেন। স্বস্তিকা পত্রিকাতেও দিল্লী থেকে পাঠানো তাঁর লেখা মাঝে-মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। বিজেপি-র মুখপত্র কমল সন্দেশ-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট (ইন্ডিয়া)-র তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র নারদ জয়ন্তী উৎসবে তাঁকে সংবর্ধনা জানায়। তাঁর পরলোকগমনে স্বস্তিকা একজন লেখক তথা শুভানুধ্যায়ীকে হারাল।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় শৈক্ষিক সঙ্ঘ

গত ২২-২৩ নভেম্বর শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকদের একটি সম্মেলনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় শৈক্ষিক সঙ্ঘ গঠিত হলো। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যকারী মণ্ডলের সদস্য অজিত বিশ্বাস এবং জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের প্রাদেশিক সম্পাদক অধ্যাপক নির্মল মাইতি।

এই সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি হিসেবে অধ্যাপক চক্রধর ত্রিপাঠী এবং সম্পাদক অধ্যাপক ড. উমেশ চন্দ্র সিং নির্বাচিত হয়েছেন। বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জার্নালিজম ও মাস কমিউনিকেশন বিভাগের অধ্যাপক ড. বিপ্লব লোহু চৌধুরী, বটানি বিভাগের অধ্যাপক আডানি লোখো, জাপানি শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক অজয় কুমার দাস, শিক্ষা সত্রের অধ্যাপক গৌতম সাহা, বিনয় ভবনের অধ্যাপক সনৎ কুমার রথ, কমপিউটার বিভাগের অধ্যাপক মধুসূদন পাল প্রমুখ।

রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের অজিত বিশ্বাস বলেন, জাতীয় অধ্যাপক মঞ্চের কাজ ১৯৯৪ সাল থেকে চলছে। বাংলায় শিক্ষাক্ষেত্রে বামপন্থী দলতন্ত্র শেষ হয়েছে কিন্তু আজ সেই ক্ষেত্রে মধ্যমেধা ও দলতন্ত্রের জয়জয়কার চলছে। তৃণমূল শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বনাশা বামপন্থী থেকে আরো নিম্নগামী ও শিক্ষাকে দলদাসের হাতে তুলে দিয়েছেন। আমাদের আবেদন— বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় শৈক্ষিক সঙ্ঘ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শকে সুন্দরভাবে তুলে ধরুন। আমাদের এই রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক সঙ্ঘ সারা ভারতে সংগঠন গড়ে তুলেছে। আমাদের উদ্দেশ্য, সারা ভারতে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রী অরবিন্দের জাতীয় ভাবধারাকে প্রসারিত করা, জাতীয়তাবোধ এবং দেশাত্মবোধে ছাত্রসমাজ ও শিক্ষক সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা। ■

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর,
বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ /
৯২৩৩১৮৯১৭৯

কোচবিহার জেলার মাথাভাঙার স্বয়ংসেবক ধীমান ভট্টাচার্যের বিবাহে মঙ্গলনিধি অনুষ্ঠানে বিভাগ সঙ্ঘচালক সতীশ বর্মন, বিভাগ কার্যবাহ সাধন পাল ও প্রান্ত প্রচারক গোবিন্দ ঘোষ।

সোনার ছেলে কিদাম্বি শ্রীকান্ত

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

চীনের মাটিতে দাঁড়িয়ে চৈনিক আধিপত্য খর্ব করে কোনো ভারতীয় সুপার সিরিজ (প্রিমিয়ার) খেতাব জিতে আসছে, এ দৃশ্য কয়েকদিন আগে দূরতম কল্পনাতেও দেখা সম্ভব ছিল কি? আর তাই সম্ভব করে দেখিয়েছেন দক্ষিণ ভারতীয় তরুণ কিদাম্বি শ্রীকান্ত। আর ওই খেতাব জয়ের সুবাদেই বিশ্ব ব্যাডমিন্টন র‍্যাঙ্কিয়ে প্রথম দশের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন শ্রীকান্ত। এতদিন আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন সার্কিটে ভারতীয় পুরুষদের মুখ বলতে ছিলেন পুরুডেল্লি কাশ্যপ। এখন সেই তালিকাতে

শুধু ঢুকে পড়াই নয়, কাশ্যপকে ছাপিয়েও গেলেন শ্রীকান্ত। কাশ্যপ এবছর কমনওয়েলথ গেমসে সিঙ্গলসে সোনা জিতেছেন। এছাড়া সার্কিটে বড় মাপের কোনো সাফল্য নেই। তাঁর দৌড় কোয়ার্টার ফাইনাল বড় জোর সেমিফাইনাল পর্যন্ত। তবে যে কোনোদিন প্রিমিয়র খেতাব জেতার মতো অবস্থায় চলে যেতে পারেন। তাঁর দক্ষতা ও প্রতিভায় কোনো ঘাটতি নেই— অন্তত দুই প্রাক্তন অল ইংল্যান্ড খেতাব জয়ী প্রকাশ পাড়ুকোন ও পুপেল্লা গোপীচাঁদ তাই মনে করেন।

চীনা ওপেনে এবার গ্রান্ড ডাবল হয়েছে। মেয়েদের রাজমুকুটটিও উঠেছে সাইনা নেওয়ালের মাথায়। সাইনা এক জাপানি খেলোয়াড়কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তাঁকে এ চীনা হার্ডল টপকাতে হয়নি। অন্যদিকে শ্রীকান্ত ফাইনালে হারিয়েছেন এই সময়ের কিংবদন্তী লিন ডানকে। ডান পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ও লন্ডন অলিম্পিকের সোনাজয়ী। তাঁকে কোর্টের সর্বত্র দৌড় করিয়ে, শটের বৈচিত্র্য ও পাওয়ারের সামনে অসহায় অবস্থায় ফেলে হার মানতে বাধ্য করেছেন শ্রীকান্ত, ব্যাপারটি বাড়তি গর্বের এবং অবশ্যই শ্লাঘার। চীন ওপেনের পরে হংকং ওপেনে অবশ্য জয়যাত্রা ধরে রাখতে পারেননি দু'জনের কেউই। এই মরশুম প্রায় শেষ হতে চলল। আসন্ন ২০১৫ মরসুমে শ্রীকান্ত আরো অনেক রথী মহারথীকে জমি ধরিয়ে নিজের ট্রফি ক্যাবিনেটকে আরো সুসজ্জিত করবেন বলেই ভারতীয় ব্যাডমিন্টন মহলের ধারণা। আর সাইনা, পিভি সিন্ধুর কাছে আরো বড় সাফল্যের প্রত্যাশী ক্রীড়াপ্রেমীরা।

সাইনা অলিম্পিক ব্রোঞ্জজয়ী আর সিন্ধু পরপর দু'বছর বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের সেমিফাইনালিস্ট। ব্রোঞ্জকে এবার সোনা কিংবা রূপোয় পরিবর্তিত করতে পারেন কিনা, তার দিকেই লক্ষ্য থাকবে সবার। দুই মহিলাই ব্যাডমিন্টনে চীনা আধিপত্যের বিরুদ্ধে জোরদার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। যদিও এই দু'জনের এখনও অল ইংল্যান্ড বা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব করায়ত্ত হয়নি। সামনের ২/৩ বছর তাই এই দু'জনের কাছেই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সাইনা র‍্যাঙ্কিংয়ে এক সময়ে তিন নম্বরে উঠে এসেছিলেন। সিন্ধুও আছেন প্রথম দশে। সাইনা অবশ্য বেশ কিছু মাস্টার্স খেতাব জিতেছেন। সিন্ধু এ ধরনের টুর্নামেন্টে ফাইনালে গেছেন দু'বার। অন্যদিকে মহিলাদের ডাবলসে জ্বালাওট্টা ও অশ্বিনী পোনাপ্পা জুটিও বিশ্ববৃত্তে উজ্জ্বল অবস্থান তৈরি করে নিয়েছেন। এই জুটির কাছেও অনেক প্রত্যাশা ভারতবাসীর। আসলে প্রকাশ পাড়ুকোনই ভারতীয় ব্যাডমিন্টনকে সাবালক করে দিয়েছেন। ১৯৮০-তে প্রকাশ অল ইংল্যান্ড জেতেন। তার পরপরই জেতেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। আর সারা দেশে ব্যাডমিন্টনে জোয়ার এসে যায়। প্রকাশের সাফল্যে উদ্দীপিত হয়ে সৈয়দ মোদী জিতে ফেলেন কমনওয়েলথ সোনা। পরবর্তীকালে উঠে আসেন গোপীচাঁদ, তিনিও অল ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ ধাপে পা রেখেছেন। দুই মেগাতারকাই শুধু নিজেদের সাফল্যের চর্বিতচর্বণ করে থেমে থাকেননি, তৈরি করেছেন অ্যাকাডেমিও।

সেই অ্যাকাডেমিরই ফসল আজকের সাইনা, সিন্ধু কাশ্যপ, শ্রীকান্তরা। আধুনিক পরিকাঠামো, উন্নত ট্রেনিং, পারিপার্শ্বিক সমস্তরকম সুযোগ সুবিধে দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তৈরি করা হয় এই অ্যাকাডেমিতে। দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই এই অ্যাকাডেমি দু'টির জন্ম দিয়েছেন দুই চ্যাম্পিয়ন প্রাক্তনী। নিজেদের সাফল্য গৌরবের আলোকে তৈরি করার পর উত্তরসূরিদের নানাভাবে উদ্দীপ্ত করে যাচ্ছেন। তাঁদের সামনের দিকে এগিয়ে দেওয়ার এই প্রয়াস তাই প্রকাশ, গোপীচাঁদকে অন্যমাত্রা প্রদান করেছে। এখন যে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে নবজাগরণ শুরু হয়েছে, তার ভিত খেলোয়াড় ও কোচ দু' হিসেবেই গড়ে দিয়েছেন প্রকাশ পাড়ুকোন ও পুলেল্লা গোপীচাঁদ। এখন শুধু অপেক্ষা চীনকে টপকে বিশ্ব পর্যায়ে এক নম্বর শক্তি হওয়ার।

শব্দরূপ-৭৩০ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

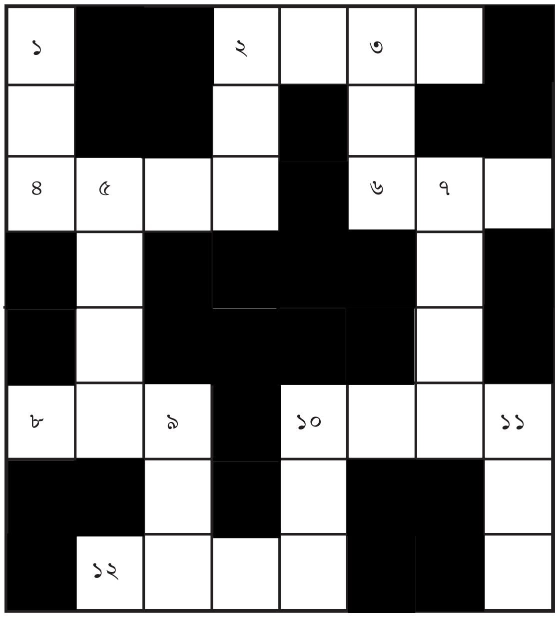

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. অষ্টবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহার্থে সম্প্রদান, ৪. মৃত্যুকালে যে ঘাম হয়, ৬. বিক্রয়ের দলিল; আগাগোড়া কদলী, ৮. বিভীষণপত্নী; কুক্কুরী, ১০. হিমালয় প্রদেশের হিন্দুতীর্থ বিশেষ, ১২. লোকান্তর, মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা।

উপর-নীচ : ১. কাশীরাজের দ্বিতীয়া কন্যা, ধৃতরাষ্ট্রের মাতা, ২. ঋষিবিশেষ; বুদ্ধদেব, ৩. পুত্র, ৫. গণেশ, ৭. ছত্রপতি শিবাজী এই অস্ত্রের সাহায্যে আফজল খাঁকে হত্যা করেছিলেন, ৯. শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা, ১০. দু'মুখো সোনা, ১১. রামায়ণে উল্লিখিত অসুর—শত্রুঘ্নের হাতে নিহত।

সমাধান
শব্দরূপ-৭২৭

ক	ড়	চা		বৃ	কো	দ	র
র্তা		কু	গ্র	হ			
	বৃ	ন্দা		তী	র্থ	কা	ক
	ষ					ক	
	সে					ব	
ধ	ন	প	তি		স	ন্ধ্যা	
			ল	হ	র		রা
দ্বৈ	মা	তৃ	ক		মা	ন	স

সঠিক উত্তরদাতা

সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৭৩০ সংখ্যার সমাধান আগামী ৫ জানুয়ারি ২০১৫ সংখ্যায়

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

কোটিপতি হোন!
নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।

যোগাযোগ ঃ দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
9830372090
9433359382
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

SURYA
EVERY CITY EVERY HOME
LED
CFL
FAN
PIPES
The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from
EVERY CITY EVERY HOME
SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

সরকারি বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও সঙ্ঘকাজ বাড়ছে : ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সম্প্রতি হরিদ্বারে কলেজ ও ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকদের একটি বৈঠকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত বলেন, ‘‘রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নিজেদের কাজ করে চলেছে। আমাদের কাজ কোনোরকম বাধা সৃষ্টির ফলে বন্ধ হয় না।’’ বৈঠকে একজন অধ্যাপক জানতে চান— অতীতে কোনো কোনো রাজ্যসরকার এবং ১৯৬৬ সালে কেন্দ্র সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সরকারি কর্মচারীদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত থাকার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। উত্তরে শ্রীভাগবত বলেন— ‘‘তা সত্ত্বেও সঙ্ঘকাজ বিস্তার লাভ করছে। সরকারি সেরকম আদেশ ওঠানোর জন্য আমরা কোনো আবেদনও জানাচ্ছি না এবং তার কোনো প্রয়োজনও নেই।’’ তিনি স্বয়ংসেবকদের নিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে বলেন— কেরল সরকার একবার এক স্বয়ংসেবককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলে সঙ্ঘের প্রচারকরূপে সে পূর্ণসময় সঙ্ঘকাজ বিস্তারে মনোনিবেশ করে।

লাভ জেহাদের বলি বেণুপ্রিয়া

সংবাদদাতা ॥ কোচবিহার জেলার পশ্চিমঘাটের বাসিন্দা সহদেব কুণ্ডুর কন্যা বেণুপ্রিয়া কুণ্ডু প্রেমে পড়ে সানু বসাক নামে এক যুবকের। ঘটনা ২০১০ সালের। পালিয়ে গিয়ে তারা বিয়ে করে এবং বিয়ের পর দেখা যায় সানু বসাক আসলে সাহানুর আলি সিদ্দিকি। শুরু হয় নিষিদ্ধ মাংস খাইয়ে ও রান্না করিয়ে পোক্ত মুসলমানি বানানোর প্রক্রিয়া। বেঁকে বসেন বেণুপ্রিয়া। শুরু হয় অকথ্য অত্যাচার। এরই মধ্যে জন্ম হয় এক কন্যা সন্তানের। অত্যাচার বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে যায় যে শ্বশুরমশাই পর্যন্ত শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় বেণুপ্রিয়ার। পালিয়ে আসে, কিন্তু বাপের বাড়ি আশ্রয় না পেয়ে মামার বাড়িতে গিয়ে ওঠে।

গত ১৬ নভেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে শীতলখুচি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ পরিচালিত হিন্দু মিলন মন্দিরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কন্যাসহ স্বধর্মে ফিরে আসে বেণুপ্রিয়া। এই পরাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অগ্নিশানন্দ মহারাজ, স্থানীয় হিন্দু মিলন মন্দিরের সভাপতি সুরজিৎ কুমার রায়, সম্পাদক ফুলেশ চন্দ্র বর্মণ। হিন্দু মিলন মন্দিরের কোচবিহার জেলা সম্পাদক বিকাশ রায়, বিশ্ব বিন্দু পরিষদের শীতলকুচি প্রখণ্ড সভাপতি বরেন চন্দ্র বর্মণ ও সম্পাদক দিলীপ কুমার বর্মণ।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
8 December - 2014

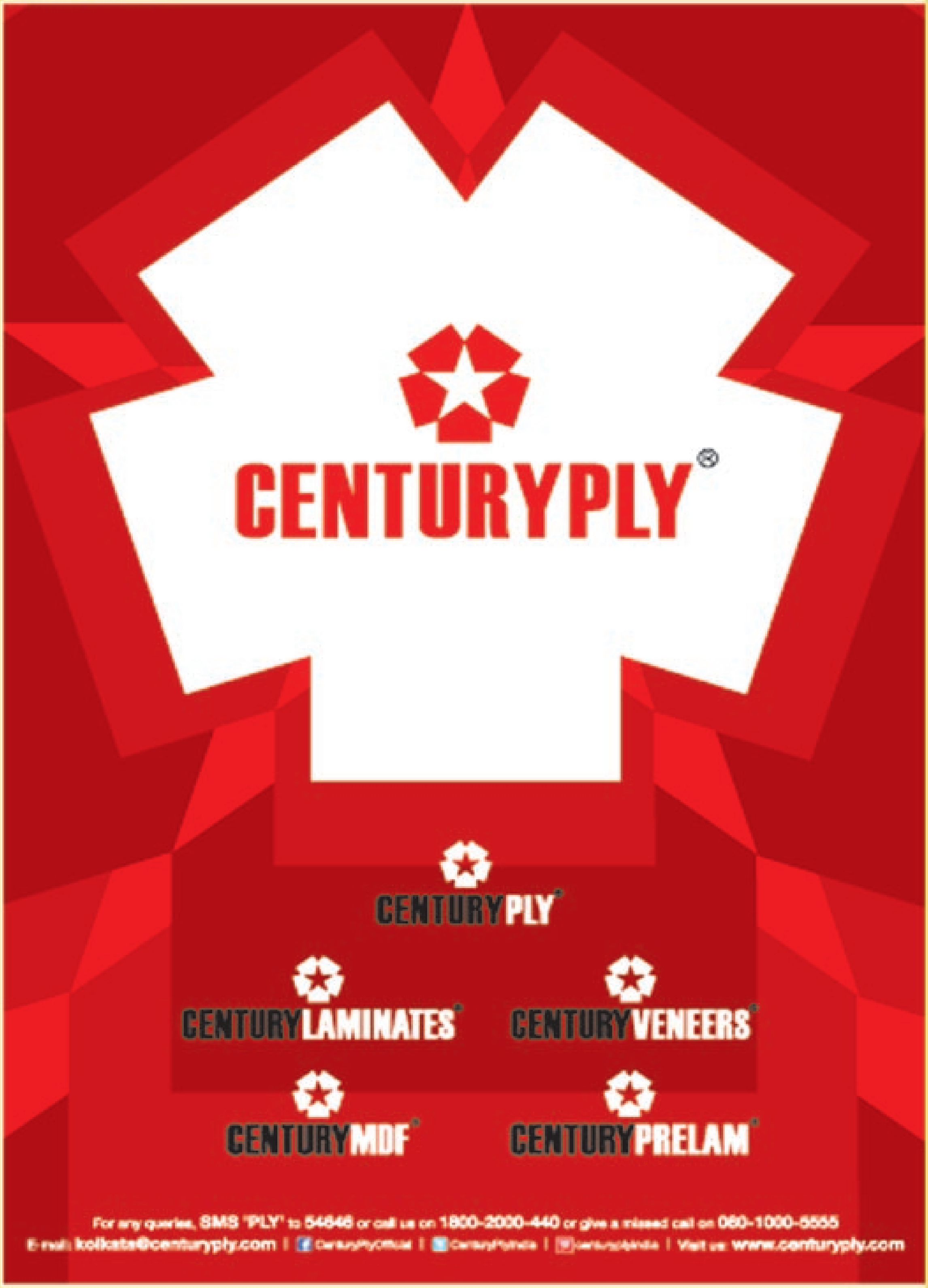

দাম : ১০.০০ টাকা